# সম্পাদকীয়

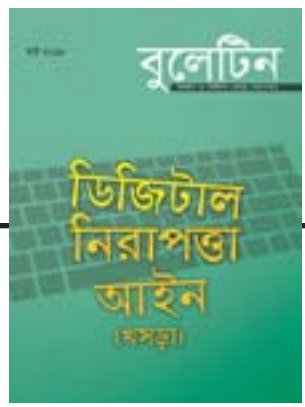


২৯ জানুয়ারি ২০১৮ 'জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে বর্তমান মন্ত্রিসভা। এ অনুমোদনের পর থেকেই খসড়া আইনটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক দেখা যায়। বিগত বছরগুলিতে আইসিটি আইনের ৫৭ ধারায় দায়ের করা মামলার সংখ্যা বুকে কাঁপনধরিয়ে দেয়। খোদ মন্ত্রী মহোদয়গণও এর অপব্যবহার নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। কিন্তু ৫৭ ধারা বিলুপ্তিরঘোষণা হলেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়ার ২৫, ২৬, ২৯ ও ৩১ ধারায় আইসিটি আইনের অনুরূপ বক্তব্য যুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া ৩২ ধারা সাংবাদিক, লেখকসহ তথ্য সংগ্রহের কাজে যুক্ত পেশাজীবীদের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আসক মনে করে, আইনটি কার্যকর করার আগে এর বিভিন্ন ত্রুটি সংশোধনে রাষ্ট্রের উদ্যোগী ভূমিকা নেওয়া জরুরি। নাগরিকের মতপ্রকাশের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের আরো দায়িত্বশীল হওয়া দরকার বলে মনে করে মানবাধিকার সংগঠন আসক। উল্লেখ্য যে, খসড়া আইনটি পাসের পর থেকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সাংবাদিকতা, ধর্মীয় অনুভূতিতেআঘাত, মানহানি ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচনা আবর্তিত হচ্ছে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সাইবার অপরাধ ও হুমকি মোকাবিলায় আইনটি বাস্তবসম্মত কি না, আইনে কোনো বিষয় বাদ পড়েছে কি না, এই বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা কী এবং সেগুলোর বাস্তবায়নে প্রস্তুতি কতটুকু–এমন বিষয়েও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এর সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এই বিষয়গুলো নিয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা এখনো আলাপ-আলোচনা শুরু করতে পারেন। সবশেষে বলতে হয়, নতুন আইন সমাজে সুফলতাবয়ে আনে এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে।

এবারের আইন-আদালত বিভাগের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় 'রূপা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায়'। গত ১২ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের বিচারক এই রায় দিয়েছেন। রায়ে অভিযুক্ত পাঁচজনের মধ্যে চারজনের মৃত্যুদণ্ড এবং একজনের সাত বছরের কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া যে বাসের মধ্যে এই ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডটি ঘটানো হয়েছিল, সেই বাসটির মালিকানা রূপার পরিবারকে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। উল্লেখ্য, গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বগুড়া থেকে ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে চলন্ত বাসে ধর্ষণ ও হত্যার শিকার সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার মেয়ে রূপা পড়াশোনার পাশাপাশি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী।

নারী ধর্ষণ ও হত্যা বিষয়ে আইন-আদালত পর্বের আরেকটি রচনা 'মারমা তরুণী ও তনুহত্যা ধর্ষণ মামলা'। ঘটনা-পরবর্তী দু মাস সময় অতিক্রান্ত হলেও মারমা তরুণী ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী সোহাগি জাহান তনুধর্ষণ ও হত্যার দুবছর পার হয়েছে। এখনো দায়ী ব্যক্তি শনাক্ত হয়নি, মামলারও নেই কোনো অগ্রগতি। রূপা হত্যা ও ধর্ষণ মামলার রায়ের সঙ্গে এ দুটিনৃশংসঘটনায় মামলা না হওয়া বা মামলার অগ্রগতি না থাকাকে তুলনা করলে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, অধিকারের বিপরীতে কি মুখ্যহয়ে ওঠে ঘটনার স্থান, অভিযুক্তসন্দেহভাজনদের পরিচয়? তাহলে তো ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সুদূরপরাহতহয়ে যাবে। ■

উপদেষ্টা সম্পাদক: হামিদা হোসেন, শীপা হাফিজা, এডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান ❑ সম্পাদক: শাহীন আখতার
আইনগত সম্পাদনা: নিনা গোস্বামী ❑ প্রকাশনা সহযোগী: কানিজ খাদিজা সুরভী ❑ প্রচ্ছদ: মনন মোর্শেদ ❑ অঙ্গসজ্জা: অনিল চন্দ্র মন্ডল
কম্পিউটার কম্পোজ: মো. মহসিন আলী ❑ ফটোগ্রাফ: আসক, ইন্টারনেট ❑ মুদ্রক: সাহিত্য প্রকাশ

# খসড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

**মাবরুক মোহাম্মদ**

এই মুহূর্তে বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৭৬০ কোটি। পরিসংখ্যান ওয়েবসাইট স্ট্যাটিসটার হিসাব অনুযায়ী ২০১৭ সালে পৃথিবীর প্রায় ৩৫৮ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে। ২০১৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৩৯ কোটি।[১] বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) হিসাব অনুযায়ী ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৮ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী রয়েছে।[২] স্ট্যাটিসটার প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২১ সাল নাগাদ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫৩.৭ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করবে। আর বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালে দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে ইন্টারনেট সেবার আওতায় নিয়ে আসতে চায়।[৩] এই হলো বৈশ্বিক ও জাতীয়ভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের চিত্র।

ইন্টারনেটের বহুবিধ ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানের উলটা পিঠে বৃদ্ধি পাচ্ছে সাইবার ক্রাইম। স্ট্যাটিসটার হিসাব অনুযায়ী ২০১৭ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বৈশ্বিক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের শতকরা ২৭ ভাগ সাইবার হুমকির শিকার হয়েছে।[৪] সারা বিশ্বে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকদের আলোচনায় সাইবার নিরাপত্তা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই বৈশ্বিক চিত্রে বাংলাদেশ ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির পর বিষয়টি আরো গুরুত্ব পাচ্ছে। এই অবস্থায় গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৮ মন্ত্রিসভা 'জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। আইনটি অনুমোদনের পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। স্বাভাবিকভাবেই ক্রমবর্ধমান ইন্টারনেট ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী আইনটির বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী ও কৌতূহলী হয়ে ওঠে। সামাজিক গণমাধ্যমেও এই আইন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক দেখা যায়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আইনটি এখনো খসড়া মাত্র। পূর্ণাঙ্গ আইন হয়ে কার্যকর হতে এখনো অনেকগুলো ধাপ বাকি। এই ধাপগুলোতে আইনটিতে কিছু পরিবর্তন এলেও আসতে পারে। কিন্তু মন্ত্রিসভায় আইনটি অনুমোদনের পরদিন প্রায় সব পত্রিকার শিরোনাম ও আলোচনায় বিশেষত খসড়া আইনটির ৩২ ধারা নিয়ে আলোচনায় অনেকেরই মনে হতে পারে যে, আইনটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করতে হয় যে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা হলে তিনি নিজেই আদালতে তাদের পক্ষে মামলা লড়বেন।[৫]

**প্রেক্ষাপট**

আইনটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোদ আইনটিতে বলা হয়েছে 'জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল অপরাধ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন'। বাংলাদেশে ইন্টারনেট ও ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য মোটামুটিভাবে যে একটি আইন রয়েছে, সেটি হলো ২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন। এই আইনটিকে যুগোপযোগী করার জন্য ২০১৩ সালে একটি সংশোধনী আনা হয়। কিন্তু ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার এই সময়কালে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। সামনের দিনগুলোতে এই ব্যবহার আরো দ্রুত ও ব্যাপক আকারে বিস্তার করবে বলে সহজেই বোঝা যায়। এই ব্যবহার যে কেবল সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনেই করবে তা নয়। বাংলাদেশের সরকার এবং সমস্ত সরকারি স্থাপনায় এর ব্যবহারকে বৃদ্ধি করতেই হবে। এটা করতে না পারলে বাংলাদেশ বৈশ্বিক উন্নয়ন ও কর্মকাণ্ড থেকে ছিটকে পড়বে। ব্যবহারের পিঠেই থাকে অপব্যবহার। তাই বিশ্বে ও বাংলাদেশে ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর অপব্যবহারও যে বৃদ্ধি পাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ডিভাইসের অপব্যবহারের শিকার যেমন একজন ব্যক্তি হতে পারেন, তেমনি সরকার বা যে-কোনো সংস্থাও হতে পারে। তাই সময়ের প্রয়োজনেই আমাদের এমন একটি আইন দরকার, যা ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যাপক ব্যবহারকে যেমন উৎসাহিত করবে, তেমনি এর অপব্যবহার রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে এবং অপরাধ দমনে সহায়ক হবে। এই বাস্তবতাকে মাথায় রেখেই নতুন আইনটির প্রণয়ন।

ইমরান এইচ সরকারের নেতৃত্বে প্রতিরোধ সমাবেশ

**কী আছে আইনে**

খসড়া আইনে ডিজিটালের সংজ্ঞা, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব করা, ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়েছে। আইনটিতে একটি ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়েছে। একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত এই কাউন্সিলের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিধির মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে নির্ধারিত হবে। তবে আইনটির তৃতীয় অধ্যায়ে মহাপরিচালককে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মহাপরিচালকের অধিক্ষেত্রভুক্ত কোনো বিষয়ে কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য ডিজিটাল হুমকির কারণ হলে মহাপরিচালক ওই তথ্য ব্লক বা অপসারণ করতে পারবেন। আইনটির পঞ্চম অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। আইনের বিধান অনুযায়ী সরকার গেজেটের মাধ্যমে কোনো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামোকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিলের মহাপরিচালক প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর নিরাপত্তা পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন করতে পারবেন। আইনটিতে গুরুতপূর্ণ তথ্যপরিকাঠামোতে বেআইনি প্রবেশ ও ক্ষতিসাধনের জন্য দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম ইত্যাদিতে বেআইনি প্রবেশ ও ক্ষতিসাধন, কম্পিউটারে ম্যালওয়্যার ও ভাইরাস ছড়ানো, সোর্স কোড পরিবর্তন, পরিচয় প্রতারণা ও ছদ্মবেশ, অনুমতি ছাড়া পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার, সাইবার সন্ত্রাসমূলক কাজ পরিচালনা, বেআইনিভাবে তথ্য চুরি ও হ্যাকিংয়ের মতো বিষয়গুলোকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত ও দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**অপরাধ ও দণ্ড**

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় কেউ যদি ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোনো ধরনের প্রপাগান্ডা চালায়, তাহলে ১৪ বছরের জেল ও ১ কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ২৮ ধারায় বলা হয়েছে, কেউ যদি ধর্মীয় বোধ ও অনুভূতিতে আঘাত করে, সে ক্ষেত্রে ১০ বছরের জেল ও ২০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

নতুন আইনের ২৯ ধারায় মানহানিকর কোনো তথ্য দিলে এর সাজাস্বরূপ তিন বছরের জেল ও ৫ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ৩২ ধারায় বলা হয়েছে, সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কেউ যদি বেআইনিভাবে প্রবেশ করে কোনো ধরনের তথ্য-উপাত্ত, যে-কোনো ধরনের ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি দিয়ে গোপনে রেকর্ড করে, তাহলে সেটা গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ হবে এবং এ অপরাধে ১৪ বছর কারাদণ্ড ও ২০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

আইনে বলা হয়েছে, কেউ যদি বেআইনিভাবে কারো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে, তাহলে তাকে সাত বছরের জেল ও ২৫ লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেয়া হবে। বেআইনিভাবে অন্য সাইটে প্রবেশ করার পর যদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে ১৪ বছরের জেল ও ১ কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। আবার কেউ যদি বেআইনিভাবে কারো ডিভাইসে প্রবেশ করে, তাহলে এক বছরের জেল ও ৩ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। কেউ যদি কারো ডিভাইসে প্রবেশে সহায়তা করে, তাহলে তিন বছরের জেল ও ৩ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ১৭ ধারায় বলা হয়েছে, ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কেউ যদি জনগণকে ভয়ভীতি দেখায় এবং রাষ্ট্রের ক্ষতি করে, তাহলে ১৪ বছরের জেল ও ১ কোটি টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ২৫ ধারায় বলা হয়েছে, কেউ যদি ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল মাধ্যমে আক্রমণাত্মক ভয়ভীতি দেখায়, তাহলে তাকে তিন বছরের জেল ও তিন লাখ টাকা জরিমানাসহ উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ৩০ ধারায় বলা হয়েছে, না জানিয়ে কেউ যদি কোনও ইলেকট্রনিকস ডিভাইস ব্যবহার করে ব্যাংক-বিমায় ই-ট্রানজেকশন করে, তাহলে পাঁচ বছরের জেল ও পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ৩১ ধারায় বলা হয়েছে, ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে কেউ অরাজকতা সৃষ্টি করলে সাত বছরের জেল ও ৫ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

খসড়া আইনটির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আইনটিতে কেবল অপরাধ সংঘটনের জন্যই নয়, অপরাধ সংঘটন করার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো ব্যক্তিকে আটক করা যাবে। এ ছাড়াও আইনটিতে অর্থদণ্ডের ক্ষেত্রে বিরাট অঙ্ক উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও খসড়া আইনটির অপরাধ ও দণ্ড অংশে সর্বোচ্চ শাস্তির উল্লেখ থাকলেও সর্বনিম্ন শাস্তির উল্লেখ নেই। এখানে আদালত তার বিবেচনা প্রয়োগ করে শাস্তি নির্ধারণ করবেন। তাই আদালতের জন্য স্বাধীনতা এখানে রাখা হয়েছে। আইনটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে একই অপরাধ বারবার করার জন্য আলাদা করে কঠোরতার দণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, আইনটি মূলত নিবর্তনমূলক (preventive)– অর্থাৎ দণ্ডের ভীতি আরোপ করে অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, কেবল কঠোর শাস্তির বিধান করে কাউকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করা যায় না। শাস্তির ভয় দেখিয়ে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করা গেলে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের মাত্রা কেবল কমে আসাই নয়, বরং ন্যূনতম পক্ষে কিছু অপরাধ বন্ধই হয়ে যাবার কথা।

### আলোচিত ৫৭ ধারার বিদায়

ডিজিটাল নিরাপত্তা (খসড়া) আইনটির ৬২ ধারায় বলা হয়েছে যে, আইনটি কার্যকর হবার সঙ্গে সঙ্গে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা বিলুপ্ত হবে। এ ছাড়াও ওই আইনের ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৬৬ ধারাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে এই ধারাগুলোর অধীনে সাইবার ট্রাইব্যুনালে কোনো কার্যধারা বা মামলা যে-কোনো পর্যায়ে বিচারাধীন থাকলে মামলাগুলো এমনভাবে চলমান থাকবে যেন ধারাগুলো বিলুপ্ত হয়নি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা বিস্তারিতভাবে কোনো ওয়েবসাইট বা কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে বেশ কয়েকটি কাজকে অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করেছে। ৫৭ ধারার ভাষ্য হলো, 'কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।' ধারাটি বেশ কয়েকটি অপরাধের কথা বললেও সাম্প্রতিক সময়ে মানহানি, ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়া ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের

# ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষায় সচেতন হোন

## আন্তর্জাতিক তথ্য সুরক্ষা দিবস

**শরিফুল ইসলাম সেলিম**

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ বিস্তারের যুগে কোনো কিছুই আর গোপন নয়। কারণ অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে সবার তথ্যই কারো না কারো কাছে সংরক্ষিত। যেমন, ইমেইল হলে ইয়াহু, জিমেইল, হটমেইল বা এজাতীয় কোনো সার্ভারে সংরক্ষিত আছে সব গোপনীয় মেইল বা ফাইল। ফেসবুকের সব তথ্য পাওয়া যাবে ফেসবুক সার্ভারে। আবার টেলিকমিউনিকেশন হলে গ্রামীণফোন, সিটিসেল, রবি, এয়ারটেল, টেলিটকের সার্ভারে পাওয়া যাবে সব এসএমএস, কনভারসেশন। ভয়েজ বা ভিডিও চ্যাট হলে স্কাইপ বা সে রকম কোনো সংশ্লিষ্ট সাইটে জমা হয় সব ডেটা। অনুরোধ সাপেক্ষে এসব তথ্য প্রাপ্তিও সম্ভব। তবে অনেকেরই অজানা যে, এ তথ্য আপনি না চাইলেও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অনুরোধ বা রিকুইজিশন সাপেক্ষে দেখতে বা পেতে পারে। আর সংশ্লিষ্ট সার্ভারগুলোর চাকরিজীবীরা তো অবশ্যই। কাজেই সাবধান থাকতে হবে আমাদের প্রত্যেককেই।

ভার্চুয়াল জগতে নিজের অজান্তে মুর্হূতের মধ্যেই অনেক তথ্য চলে যায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ নানাভাবে ইন্টারনেটে আমরা কোনো না কোনোভাবে যুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহৃত হয় পণ্য হিসেবে। যেমন, আমাদের মুঠোফোন ও ইমেইলে প্রতিনিয়ত সময়ে অসময়ে বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপন নিয়ে আসছে বিভিন্ন ধরনের ভয়েস কল, এসএমএস ও ইমেইল। যা বিভিন্ন সময় বিরক্তির উদ্রেক করে। যেমন, আপনি একটি ক্রেডিট কার্ডের জন্য

বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয় এবং বারবার আলোচনায় উঠে আসে। সাইবার সিকিউরিটি ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটরের গণমাধ্যমকে দেয়া তথ্যমতে, ২০১৭ সালের জুলাই পর্যন্ত সারা দেশে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে দায়ের হওয়া ৭৪০টি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে ৬০ শতাংশ মামলা রয়েছে ৫৭ ধারায়। ২০১৩ সালে প্রথম তিনটি মামলা হওয়ার পর প্রতিবছর মামলার সংখ্যা বেড়েছে। ২০১৪ সালে সারা দেশে ৩৩টি মামলা হলেও ২০১৫ সালে এসে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫২তে। ২০১৬ সালে ৫৭ ধারায় মামলা হয় ২৩৩টি, আর ২০১৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই ধারায় মামলা হয়েছে ৩২৩টি।[৬] এই ধারার অধীনে প্রধানত সাংবাদিকরা মামলার শিকার হন। এ ছাড়াও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, ব্যক্তিগত শত্রুতা, হয়রানিসহ নানান উদ্দেশ্যে ধারাটির মূলত অপব্যবহার হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, আইনজ্ঞসহ প্রায় সব মহল থেকেই এই ধারার ব্যাপারে বারংবার উদ্বেগ জানানো হয়, ধারাটির অপব্যবহার বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা বাতিল হবে বলে জানিয়ে আইনমন্ত্রী সবাইকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন।[৭] এই অবস্থায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ৫৭ ধারার অপপ্রয়োগ বন্ধ জরুরি বলে মত দেন।[৮] এর কিছুদিন পরেই জনাব ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের জেলাপর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে ৫৭ ধারায় মামলা করার আগে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের অনুমতি নেয়ার নির্দেশ দেন। টেলিফোন বার্তায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জানান, দলের কোনো নেতা ৫৭ ধারায় মামলা করতে চাইলে তথ্য-প্রমাণসহ উপযুক্ত অভিযোগ নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তৃণমূল থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের সত্যতা পেলে তবেই ৫৭ ধারায় মামলা করার অনুমতি দেয়া হবে। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের অনুমতি ছাড়া কোনো নেতা ৫৭ ধারায় মামলা করলে দল তার বিরুদ্ধে দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে।[৯] এর মধ্যেই পুলিশ মহাপরিদর্শকের সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ৫৭ ধারায় মামলা নেয়ার আগে থানা পুলিশকে সদর দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। পুলিশের আইন শাখা অনুমোদন না করলে থানাগুলো মামলা নিতে পারবে না। গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী পুলিশের

আবেদন করেছেন। এর কিছুদিন পর থেকেই দেখবেন আপনার মোবাইলে ও ইমেইল অ্যাড্রেসে বিভিন্ন ব্যাংকের ক্রেডিটকার্ড সংক্রান্ত অফার একের পর এক আসতেই আছে। একইভাবে কোনো ই-কমার্স সাইট থেকে কোনো পণ্য কিনেছেন, দেখবেন অন্যান্য ই-কমার্স সাইট থেকে একের পর এক মেইল আসতেই আছে। আর সংশ্লিষ্ট মোবাইল ফোন কোম্পানির অফারের কথা না-ই বা বললাম। তাই ব্যক্তিগত তথ্য বাণিজ্যিকীকরণ বিষয়ে সচেতনতা জরুরি। এতে আবার তথ্যের অপব্যবহারও হয়। এজন্য প্রয়োজন অবাধে বিভিন্ন জায়গায় নিজের ব্যক্তিগত তথ্য ছড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকা।

তবে এসব তথ্য সুরক্ষার দায়িত্ব সংশ্লিষ্টদের দেয়ার আগে নিজেকেও সচেতন থাকতে হবে। ই-কমার্স বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন বা সাইন-আপ করার সময় বিভিন্ন ধরনের তথ্য দিতে হয়। এতে অনেক সময় পাসওয়ার্ডও দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা সহজে মনে রাখার জন্য সব সাইটে, ইমেইলে ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করি, যা মোটেও নিরাপদ নয়। কেননা এই পাসওয়ার্ডগুলো সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর সার্ভারে জমা থাকে। তাই প্রত্যেকটি পাসওয়ার্ড ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। নিজের ইমেইল বা অন্য সব অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড যথেষ্ট কঠিন হওয়া আবশ্যক। কারণ পাসওয়ার্ড যে-কোনো সময় হ্যাক হতে পারে। নিজের অজান্তেই কেউ নিয়ে নেবে পাসওয়ার্ডের নিয়ন্ত্রণ। ব্যস, শেষ সব গোপনীয়তা। সেজন্য পাসওয়ার্ডকে মাঝেমধ্যে পরিবর্তন করতে হয়। কারণ হ্যাকাররা পাসওয়ার্ড হ্যাক করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যায়। তাই পাসওয়ার্ড যথেষ্ট জটিল কিন্তু নিজে মনে রাখার জন্য সহজ হওয়া উচিত।

ফেসবুকেও বহু প্রতারণার জাল ফেলা আছে। আপনাকে ক্লিক করতে প্রলোভন দেখানো হবে। অতঃপর ক্লিক করলেই সব গেল। এমন হাজারো পথ রয়েছে। কাজেই সাবধান।

**কেন আমাদের অনলাইন প্রাইভেসি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত**

একটি জাতির ভিত্তি কেমন, জাতি হিসেবে তার পরিসর কত, পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অবস্থা সাপেক্ষে তার গৌরবের জায়গা কতটুকু– এ সবই নির্ভর করে সেইজাতি তথ্য সৃষ্টিতে কতটুকু সৃষ্টিশীল এবং তথ্যপ্রবাহে কতটুকু অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। একই সঙ্গে তথ্য সুরক্ষার মাধ্যমে সব কৃষ্টি ও সৃষ্টিকে লালন করতে

তৎকালীন আইজি এ কে এম শহিদুল হক পুলিশ সদর দপ্তরে এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে বলেন, ৫৭ ধারার অপপ্রয়োগের বিভিন্ন অভিযোগ আসার পর তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, ৫৭ ধারাটি করা হয়েছিল বিভিন্ন সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের জন্য। 'অপরাধ হচ্ছেও এবং ধারাটির হয়তো প্রয়োজনও রয়েছে। কিন্তু ইদানীং অনেক অভিযোগ আসছে এই ধারাটির অপপ্রয়োগ হচ্ছে।'[১০] এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, সরকারি মহলেও ৫৭ ধারা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেয়। এই ধারাটির যথেচ্ছ অপব্যবহারের ফলে সরকারের ভাবমূর্তিও সংকটে পড়ে যায়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নীতিনির্ধারক মহল যে সচেষ্ট হয় সেটা আইনমন্ত্রীর আশ্বাস, আর জনাব ওবায়দুল কাদের ও পুলিশের তৎকালীন আইজির নির্দেশনাতেও স্পষ্ট। এ ছাড়াও ৫৭ ধারার বিদায়ের জন্য সরকার ধীরে ধীরে একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে বলেই এই নির্দেশনাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মনে রাখতে হবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা এখনো বলবৎ। এমনকি ধারাটি বিলুপ্ত হলেও এই ধারার অধীনে ইতিমধ্যেই দায়েরকৃত মামলাগুলো চলমান থাকবে। আর খসড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এই ৫৭ ধারার বিষয়বস্তুকে চারটি ভাগে ভাগ করে ২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১ ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২৫ ধারায় আক্রমণাত্মক, মিথ্যা বা ভীতিপ্রদর্শক তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ ইত্যাদি, ২৮ ধারায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, ২৯ ধারায় মানহানিকর তথ্য প্রকাশ ও সম্প্রচার এবং ৩১ ধারায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর বিষয়গুলোর অপরাধ ও দণ্ডের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

রাঙামাটিতে কর্মরত সাংবাদিকদের মানববন্ধন

হবে দীর্ঘকাল। কারণ তথ্য সুরক্ষা মানেই শুধু তথ্য চুরি রোধ নয়। তথ্যকে যুগ যুগ ধরে রাখাও তথ্য সুরক্ষার একটি বিষয়।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অবিরাম তথ্যপ্রবাহ তৈরি করছি। বর্তমানে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৭ কোটির বেশি। স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি, যা ২০২০ সাল নাগাদ ৫ কোটিতে দাঁড়াবে। আজকে আমরা আমাদের জীবনের বেশিরভাগ সময় ইন্টারনেট ও আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা ডিভাইসগুলোতে ব্যয় করছি। এখনো খুব কম মানুষই জানে যে, আমাদের ব্যবহৃত ডিভাইস ও অনলাইন সেবা থেকে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং তা শেয়ার করা হচ্ছে। এসব তথ্য অনির্দিষ্টভাবে গচ্ছিত করা হতে পারে এবং আমাদের ব্যক্তিগত এসব তথ্য উপকারে ব্যবহার করা হতে পারে আবার অবাঞ্ছিতভাবেও ব্যবহার করা হতে পারে। এমনকি দেখা গেছে, অনলাইনে অনুপকারী তথ্য শেয়ার করার ফলেও তা আপনার আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করতে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আপনার প্রিয় রেস্টুরেন্ট অথবা অনলাইনে যেসব আইটেম আপনি ক্রয় করেছেন তা শেয়ার করা।

রাষ্ট্রের কাছে শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন, বস্ত্র ও আইনের সেবা পাওয়ার অধিকার যেমন আমাদের রয়েছে, তেমনি আমাদের তথ্য সুরক্ষার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। ১৯৮১ সালে ইউরোপের বৃহৎ সংগঠন 'কাউন্সিল অব ইউরোপে' কনভেনশন ১০৮ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রথম তথ্য সুরক্ষা দিবস উদ্‌যাপন শুরু হয়। 'কনভেনশন ১০৮' গোপনীয়তা ও তথ্যসুরক্ষা নিয়ে প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা প্রতিপালনের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ২৮ জানুয়ারি ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি অ্যালায়েন্স (এনসিএসএ)-এর নেতৃত্বে দিবসটি পালিত হয়।

আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য এবং আমাদের অভ্যাস ও আগ্রহ ইন্টারনেট অব থিংসের (আইওটি) মতো প্রযুক্তিগত অগ্রসরতার আগামী প্রজন্মের জ্বালানি। আইওটি বলতে আমাদের বাসাবাড়ি, স্কুল ও কর্মক্ষেত্র– সব জিনিসেই ইন্টারনেট ডিভাইসের সংযোগ থাকাকে বোঝায়। তাই কীভাবে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা করা যায় ভোক্তাদের তা অবশ্যই শিখতে হবে। পাশাপাশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে, ভোক্তাদের ব্যক্তিগত তথ্য লেনদেনের পদ্ধতি ও তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কে তারা স্বচ্ছ। ভবিষ্যতে সংযুক্ত প্রযুক্তির (আইওটি) মাধ্যমে আমাদের জীবনযাপনের বিকাশ ঘটানোর অসাধারণ সুযোগ মিলবে। কিন্তু

### নতুন উদ্বেগ ৩২ ধারা

প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারা নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে আইনের ৩২ ধারাটি স্বাধীন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য বাধা হবে বলে অভিযোগ করছেন সাংবাদিকরা। নতুন আইনের ৩২ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি বেআইনিভাবে প্রবেশের মাধ্যমে কোনো সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বিধিবদ্ধ কোনো সংস্থার অতিগোপনীয় বা গোপনীয় তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটার, ডিজিটাল যন্ত্র, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারণ, প্রেরণ বা সংরক্ষণ করেন বা করতে সহায়তা করেন, তাহলে সেই কাজ হবে কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ। এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ১৪ বছরের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হবে। কেউ যদি এই অপরাধ দ্বিতীয়বার বা বারবার করেন, তাহলে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড ভোগ করতে হবে। বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, আইনটি সঠিক ও স্বচ্ছতার সঙ্গেই করা হয়েছে। সত্য রিপোর্ট প্রকাশ করলে বোঝা যাবে। যদি প্রতিবেদন সত্য হয়, তাহলে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি আরো বলেন, 'পত্রপত্রিকায় সাংসদদের নামে চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অনেকে তথ্য সরবরাহ করার চেষ্টা করে, যেগুলো সঠিক নয়। এগুলো সাংবাদিকদের বিবেচ্য বিষয়।' এই আইন সাংবাদিকতার স্বাধীনতায় বাধা হবে না বলে মনে করেন তোফায়েল আহমেদ। আইন করেও সাংবাদিকদের থামানো যাবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। আর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ৩২ ধারা নিয়ে ভীতিকে অহেতুক বলে মন্তব্য করেন। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, গুপ্তচরবৃত্তি তো আগেও আইনে অপরাধ ছিল। এ আইনের মধ্যে যেটা করা হয়েছে সেটা হলো, কম্পিউটার সিস্টেম বা ইনফরমেশন টেকনোলজির সিস্টেমের মাধ্যমে যদি কেউ গুপ্তচরবৃত্তি করে, সেটা অপরাধ হিসেবে ধরা হয়েছে। এটার সঙ্গে সাংবাদিকতার কোনো সম্পর্ক আছে বলে তার মনে হয় না।[১১]

এক বিবৃতিতে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বলেছে, ৩২ ধারা সাংবাদিক, লেখকসহ তথ্য সংগ্রহের কাজে যুক্ত পেশাজীবীদের কর্মক্ষেত্র সংকুচিত করবে বলে আশঙ্কা আছে। আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা বিলুপ্তির ঘোষণা হলেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খসড়ার ২৫, ২৬, ২৯ ও ৩১ ধারায় আইসিটি আইনের অনুরূপ বক্তব্য যুক্ত করা হয়েছে। এই আইন নাগরিকের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবণতা তৈরি করবে। আসক মনে করে, আইনটি কার্যকর করার আগে এর বিভিন্ন ত্রুটি সংশোধনে রাষ্ট্রের উদ্যোগী ভূমিকা নেওয়া উচিত। নাগরিকের মতপ্রকাশের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রকে আরো দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এই মানবাধিকার সংগঠন।

### সাইবার অপরাধ আলোচনার বাইরে

খসড়া আইনটিকে সাধারণভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়– আইনি দিক ও তথ্যপ্রযুক্তিগত দিক। খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের আগে ও পরে যেসব আলোচনা হয়েছে তার অধিকাংশই আইনি দিক নিয়ে হয়েছে। আইনটির যেসব বিধান সাংবাদিক, লেখক, গবেষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে প্রভাবিত করবে, সেগুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট সবাই মোটামুটি আলোচনা করেছেন। যারা এই খসড়া আইনের বিধানের সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে

আমরা কেবল তখনই একটি অধিক নিরাপদ ও আস্থাশীল ইন্টারনেট ব্যবস্থা তৈরি করতে পারব যদি আমরা প্রত্যেকেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই এবং ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষায় পারস্পরিক সহযোগিতা করি।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৩(খ) নম্বর অনুচ্ছেদে প্রাইভেসি রাইটস বা ব্যক্তির তথ্য সুরক্ষা ও গোপনীয়তা মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা (অনুচ্ছেদ ১২) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সনদ (অনুচ্ছেদ ১৭), জাতিসংঘের কনভেনশন অন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স (অনুচ্ছেদ ১৪) এবং শিশু অধিকার সনদ (অনুচ্ছেদ ১৬)-এ প্রাইভেসিকে অধিকার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর ধারা ৬৩-এর উপধারা ১-এ বলা হয়েছে, 'এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, কোনো ব্যক্তি যদি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোনো বিধানের অধীন কোনো ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোনো বিষয় বস্তুতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে, কোনো ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোনো বিষয়বস্তু অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ' এবং 'কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক দুইলক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।' তবে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যক্তি-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রচার ও প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কীভাবে বজায় থাকবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নাই।

তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করার আগে কোন তথ্যটি কেন, কী উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হচ্ছে তা অবশ্যই শনাক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং স্বাভাবিক সময়ে বা বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া, ব্যক্তিগত তথ্য অবশ্যই ব্যক্তির সম্মতিতে সংগ্রহ করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ফোন কোম্পানি ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করে, তারা যাতে সংগঠনের গোপনীয়তার নীতি মেনে চলে সে বিষয়ে সরকারের স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন ডেটা সংরক্ষণ নীতিমালা তৈরি ও তথ্য সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা। ■

ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্বিকভাবেই মুক্তচিন্তাচর্চার সুযোগের সঙ্গে মানহানিকর বক্তব্য (hate speech) বাড়ছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। তাই সারা বিশ্বেই আইনজ্ঞরা মানহানিকর বক্তব্যকে যতটা সম্ভব ছাড় দেয়ার পক্ষে। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট মাটাল বনাম টাম মামলার রায়ে মানহানিকর বক্তব্যকেও মতপ্রকাশ করার স্বাধীনতা বলে উল্লেখ করেছে।

চিন্তিত, তারা নিজেদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু আইনটিতে তথ্যপ্রযুক্তির অনেক বিষয়ও সন্নিবেশিত হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিধানগুলো কতটা সময়োপযোগী, কার্যকর ও বিস্তারিত– সেটা নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের কোনো আলোচনা করতে দেখা যায়নি। বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সাইবার অপরাধ ও হুমকি মোকাবিলায় আইনটি বাস্তবসম্মত কি না, আইনে কোনো বিষয় বাদ পড়েছে কি না, এই বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা কী এবং সেগুলোর বাস্তবায়নে প্রস্তুতি কতটুকু– এমন নানান বিষয়েও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। খসড়া আইনটি পাসের পর থেকে সব আলোচনা কেবল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সাংবাদিকতা, মানহানি ইত্যাদি নিয়মিত ও গতানুগতিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খেয়েছে। অদ্ভুতভাবে সরকারও নিজেকে এই আলোচনার বেড়াজালে সীমাবদ্ধ রাখে। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আইনটির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে সরকার অনেকটা স্পষ্টভাবেই ব্যর্থ হয়েছে মনে হয়। তবে আশার জায়গা হলো, সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এই বিষয়গুলো নিয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা এখনো আলাপ-আলোচনা শুরু করতে পারেন।

### নীতিনির্ধারক ও প্রণেতাদের সঙ্গে জনমানুষের দূরত্ব?

সব দিক বিশ্লেষণে দেখা যায় মানহানি, ধর্মীয় অনুভূতি, জননিরাপত্তার মতো বিষয়গুলো দিন দিন বাংলাদেশের উন্মুক্ত আলোচনায় অধিকতর জায়গা দখল করে নিচ্ছে। সরকার যেন এই বিষয়গুলোর ব্যাপারেই বেশি চিন্তিত আর সংবেদনশীল। তাই আইনগুলোতে এই বিষয়গুলোর জন্য আলাদা ও সুস্পষ্ট বিধানের আধিক্য দেখা যায়। শুধু তা-ই নয়, আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এই বিধানগুলো ব্যবহারে একটা বাড়তি উৎসাহ দেখা যায়। এই প্রেক্ষাপটে অন্যদিকে আইনজ্ঞ ও সাংবাদিকরা আবার যে-কোনো আইনের এই বিধানগুলোকেই অধিক গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। তাদের উদ্বেগের জায়গাটিও বোধগম্য। মনে রাখা দরকার যে, মান-সম্মানের অতি সচেতনতা বড় অসম্মানের কারণ হতে পারে। আর সম্মান ও ব্যক্তিত্ব এতটা ঠুনকোও হওয়া উচিত নয়, যাতে খুব সহজেই মানহানি হয়ে যায়। আর ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্বিকভাবেই মুক্তচিন্তাচর্চার সুযোগের সঙ্গে মানহানিকর বক্তব্য (hate speech) বাড়ছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। তাই সারা বিশ্বেই আইনজ্ঞরা মানহানিকর বক্তব্যকে যতটা সম্ভব ছাড় দেয়ার পক্ষে। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট মাটাল বনাম টাম মামলার রায়ে মানহানিকর বক্তব্যকেও মতপ্রকাশ করার স্বাধীনতা বলে উল্লেখ করেছে।[১২] এ ছাড়াও ইন্টারনেটের প্রসার যেন গবেষণা, যতটা সম্ভব মুক্ত তথ্যপ্রবাহ ও মুক্তচিন্তাচর্চায় সহায়ক হয়, সেটাও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। খসড়া আইনটিতে এখনো পরিবর্তন, পরিমার্জনের সুযোগ আছে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকার উত্থাপিত উদ্বেগগুলো দূর করার চেষ্টা করবে বলে আশা করা যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইন্টারনেট ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। এই বিস্তারের সঙ্গে দ্রুত যুক্ত হওয়ার ওপর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন অনেকটাই নির্ভর করছে। সমস্ত আলোচনা দেখে ও শুনে মনে হয় আওয়ামী লীগের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্লোগান কেবল দলটিরই থেকে গেছে, এটা এখনো জাতীয় উন্নয়ন এজেন্ডার বিষয়বস্তু হতে পারেনি। নীতিনির্ধারক, বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে একটা দূরত্ব রয়ে গেছে। আর এই কারণেই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'কে আমরা এখনো জাতীয় এজেন্ডায় পরিণত করতে পারিনি। খসড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের তথ্যপ্রযুক্তিগত দিক ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনার অনুপস্থিতি এর প্রমাণ। আশা করা যায়, সামনের দিনগুলোতে নীতিনির্ধারকরা বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাবেন, বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে আলোচনা করবেন আর উন্নয়নকর্মীরাও ভবিষ্যৎ ডিজিটাল বিশ্ব নিয়ে জনসচেতনতায় অংশগ্রহণ করবেন। ■


তথ্যসূত্র

১. https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/
২. http://www.btrc.gov.bd/telco/internet
৩. http://www.dhakatribune.com/sci-tech/2017/11/24/100-internet-penetration-2021/
৪. https://www.statista.com/statistics/194133/cybercrime-rate-in-selected-countries/
৫. দৈনিক *প্রথম আলো*, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৬. দৈনিক *সমকাল*, ৩০ জানুয়ারি ২০১৮
৭. দৈনিক *যুগান্তর*, ১১ জানুয়ারি ২০১৬
৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ আগস্ট ২০১৭
৯. দৈনিক *প্রথম আলো*, ৯ আগস্ট ২০১৭
১০. বিবিসি বাংলা, ২ আগস্ট ২০১৭
১১. দৈনিক *প্রথম আলো*, ৩১ জানুয়ারি ২০১৮
১২. https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2017/06/19/supreme-court-unanimously-reaffirms-there-is-no-hate-speech-exception-to-the-first-amendment/?utm_term=.124eb1140522

# মুন সিনেমা হল মালিক পাচ্ছেন ৯৯ কোটি টাকা

**এ. কে. এম বুলবুল আহমেদ**

পুরান ঢাকার যে মুন সিনেমা হলের মালিকানাসংক্রান্ত মামলায় সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের রায় এসেছিল, সেই হলের জমি ও সেখানে গড়ে তোলা স্থাপনার মূল্য বাবদ হল মালিককে ৯৯ কোটি ২০ লাখ টাকা পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। চলতি বছরের ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে তিন কিস্তিতে এই টাকা পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। আদেশের কপি পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে ২৫ কোটি টাকা, এরপর দুই মাসের মধ্যে আরো ২৫ কোটি এবং বাকি টাকা ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। আপিল বিভাগের এই আদেশের মধ্য দিয়ে ১৮ বছর ধরে চলা এক আইনি লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি হতে চলেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মো. আব্দুল ওয়াহ্হাব মিঞার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ গত ১৮ জানুয়ারি এ নির্দেশ দেন। মুন সিনেমা হলের মালিক ইটালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাকসুদুল আলমের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার আজমালুল হোসেন কিউসি, ড. তৌফিক নেওয়াজ, ব্যারিস্টার এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান খান ও অ্যাডভোকেট সাইফুল্লাহ মামুন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল একরামুল হক।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে অনেক সম্পত্তি পরিত্যক্ত বলে চিহ্নিত করে সরকার। সরকারি তথ্যমতে, এগুলোর মালিকরা মুক্তিযুদ্ধের সময় নিহত হন কিংবা বাংলাদেশ ত্যাগ করেন এবং অনেকের কোনো ঠিকানা জানা যায় না। এসব সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, নিষ্পত্তির ব্যবস্থার জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি) আদেশ জারি করেন। পুরান ঢাকার ওয়াইজঘাটে মুন সিনেমা হলের মালিক ছিল ইতালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস লিমিটেড নামের প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু ১৯৭২ সালের আদেশ বলে সিনেমা হলটিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরে শিল্প মন্ত্রণালয় এটিকে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে ন্যস্ত করে। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাকসুদুল আলম সরকারি আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালতের রায় তার পক্ষে গেলেও প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে মাকসুদুল আলম সিনেমা হলটির মালিকানা বুঝে নিতে পারেননি। ১৯৭৫ সালের পর তিনি আবারো সম্পত্তির দখল বুঝে নেয়ার জন্য আদালতে রিট করেন। ১৯৭৭ সালে রিটের নিষ্পত্তি শেষে আদালত আবেদনকারীর পক্ষে রায় দেন। তবে ১৯৭৭ সালে সরকার সামরিক রেগুলেশন বা শাসনবিধি ফরমান ঘোষণা করে, যেখানে এ ধরনের সম্পত্তির মালিকানা ফেরত না দেয়ার বিধান করা হয়। এ ফরমানে উল্লেখ করা হয় আগে সরকারি আদেশের মাধ্যমে যেসব সম্পত্তি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত করা হয়েছে, সেসব সম্পত্তির মালিকানা দাবি করে কেউ মামলা করতে পারবে না। মুন সিনেমা হলের সম্পত্তিও এর আওতায় পড়ে যায়। জাতীয় সংসদে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পঞ্চম সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীতে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে সামরিক শাসন জারির পর থেকে ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত সামরিক শাসনামলের সব আদেশ, ঘোষণা ও দণ্ডাদেশ বৈধ বলে অনুমোদন করা হয়। উক্ত রেগুলেশনটিও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। মুন সিনেমার মালিকপক্ষ পরে ১৯৯৪ সালে এই রেগুলেশনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ফের রিট আবেদন করেন।

তবে আদালত পঞ্চম সংশোধনীর আওতায় সব সামরিক রেগুলেশনের বৈধতা আদালতের চ্যালেঞ্জের আওতাবহির্ভূত বিবেচনা করে আবেদনটি খারিজ করে। এর ছয় বছর পর পঞ্চম সংশোধনীকে চ্যালেঞ্জ করে ও সম্পত্তি ফেরত চেয়ে ইতালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাকসুদুল আলম ২০০০ সালে একটি রিট আবেদন করেন। রিটের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে হাইকোর্ট বিভাগ এক ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। তাতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর খন্দকার মোশতাক, বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ও জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণকে সংবিধানবহির্ভূত ও বেআইনি ঘোষণা করা হয়। রায়ে বলা হয়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত দেশ অবৈধ ও অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখলকারীদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলেছে। ওই সময়ে খন্দকার মুশতাক আহমেদ, বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা দখলের কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি ছিল না। এ ছাড়া ওই সময়ে সামরিক ফরমানের মাধ্যমে সংবিধানে যেসব সংশোধনী আনা হয়েছে এবং সংবিধানের মৌলিক কাঠামোয় পরিবর্তন এনে যেসব আদেশ দেয়া হয়েছে তা আইনি ক্ষমতা বহির্ভূত ও অবৈধ। রায়ে সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ২৫, ৩৮ ও ১৪২ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে যেসব পরিবর্তন আনা হয়, তা আদালত বাতিল ঘোষণা করেন। তবে আদালত ওই সময়ে জনস্বার্থে করা সরকারের বেশ কিছু বেআইনি কাজকে মওকুফ করে দেন। জোট সরকারের সময়ে রাষ্ট্রপক্ষ এই

আদেশের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল দায়ের করলে আপিল বিভাগ তা লিভ টু আপিল মঞ্জুর করে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ প্রদান করে। ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট থেকে হাইকোর্টের রায়ের ওপর দেয়া স্থগিতাদেশ ২০১০ সালের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত বহাল ছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা জোট সরকারের আপিল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় এবং স্থগিতাদেশ তুলে নেয়ার আবেদন করে। উক্ত আবেদনের ওপর শুনানি গ্রহণ করে একই বছরের ৩ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সরকারের করা আপিল প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং স্থগিতাদেশ তুলে নেন।

সরকারের এই আপিল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন ও সুপ্রিম কোর্টের তিন আইনজীবী এম তাজুল ইসলাম, মুন্সী আহসান কবির ও কামরুজ্জামান ভুঁইয়া ইন্টারভেনার হিসেবে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ওই বছরই লিভ টু আপিল দায়েরের অনুমতি চান। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেন। এরপর তারা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি লিভ টু আপিল দায়ের করেন। ১৮ জানুয়ারি এই লিভ টু আপিলের ওপর শুনানি শুরু হয়। ছয় দিনব্যাপী এই শুনানি গ্রহণ করেন সুপ্রিম কোর্ট। শুনানি শেষে ২০১০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন এবং ৯০ দিনের মধ্যে মুন সিনেমা হল ইতালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস লিমিটেডকে ফেরত দিতে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টসহ সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশ দেন।

আপিল বিভাগের নির্দেশনার দীর্ঘদিন পরও মুন সিনেমা হলের মালিকানা ফেরত না পেয়ে ২০১২ সালের ১০ জানুয়ারি তৎকালীন ভূমিসচিব, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ দাখিল করে ইতালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস লিমিটেড কর্তৃপক্ষ। অভিযোগের শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ জানায়, ২০০১ সালে প্রতীকী মূল্যে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট মুন সিনেমা হল ডেভেলপারদের কাছে হস্তান্তর করে। ডেভেলপাররা মূল সিনেমা হলটি ভেঙে বহুতল ভবন নির্মাণের পর নিজেদের অংশ দোকানমালিকদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এ অবস্থায় মুন সিনেমা হল আগের অবস্থায় ফেরত দেওয়ার কোনো উপায় নেই জানিয়ে জমির মূল্য ও মুন সিনেমা হলের মূল কাঠামোর মূল্য ধরে এর মালিককে দেওয়া যেতে পারে বলে আদালতে মত দেন অ্যাটর্নি জেনারেল। শুনানির পর ২০১৭ সালের ১৫ জানুয়ারি আপিল বিভাগ ওই সম্পত্তি অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ এক প্রকৌশলীকে দিয়ে জমি ও স্থাপনার মূল্য নির্ধারণ করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দেয়। তার ধারাবাহিকতায় মূল্য নির্ধারণ করে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীর দেওয়া প্রতিবেদন রাষ্ট্রপক্ষ আদালতে উপস্থাপন করলে গত ১৮ জানুয়ারি আদালত মুন সিনেমা হলের মূল মালিক ইটালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস লিমিটেডকে ৯৯ কোটি ২১ লাখ টাকা পরিশোধের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টকে নির্দেশ দেয়। ■

**তথ্যসূত্র**

১. *প্রথম আলো*, *ইত্তেফাক*, *সমকাল*, *বণিক বার্তা*, ১৮ জানুয়ারি ২০১৮
২. বাংলাদেশ সংবিধানের ৫ম সংশোধনী
৩. হাইকোর্ট বিভাগের দেয়া ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায়
৪. ৫ম সংশোধনী বাতিলে আপিল বিভাগের রায়
৫. আসক *বুলেটিন*, ডিসেম্বর ২০১০, বিশেষ রচনা-সংবিধান সংশোধন (আব্দুল্লাহ আল ইউসুফ)

# রূপা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায়

**লতিফ মাহমুদ**

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ আলোচিত রূপা ধর্ষণ ও হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। ওই দিন টাঙ্গাইলের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এই রায় দেন। রায়ে অভিযুক্ত পাঁচজনের মধ্যে চারজনের মৃত্যুদণ্ড এবং একজনের সাত বছরের কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত। তা ছাড়া যে বাসের মধ্যে এই ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাটি ঘটানো হয়েছিল, সেই বাসটির মালিকানা রূপার পরিবারকে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। স্বল্পতম সময়ে বিচার সম্পন্ন হওয়ায় এবং অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আদেশ প্রদান করায় রূপার পরিবারসহ এই নৃশংস ঘটনায় উদ্বিগ্ন বিভিন্ন মহল সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বগুড়া থেকে ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে চলন্ত বাসে ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হন সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার মেয়ে রূপা। পড়াশোনার পাশাপাশি রূপা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। রূপাই ছিলেন তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। এই

# শিশু আইনের অসংগতি দূর করতে হাইকোর্টের নির্দেশ

**মো. নাহিদ হোসেন**

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন রহিত করে প্রণীত হয় শিশু আইন, ২০১৩। শিশুদের অধিকার রক্ষায়, আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশুদের বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে আলাদা রেখে দ্রুত বিচার প্রাপ্তির সুযোগ এবং শিশু উপযোগী আদালতের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়াই মূলত শিশু আইনের উদ্দেশ্য। ২০১৩ সালের ১৩ জুন জাতীয় সংসদে বিল আকারে পাস হয় এবং ২০ জুন তারিখে গেজেট আকারে আইনটি প্রকাশিত হয়। সময়োপযোগী এই আইনে প্রতি জেলায় শিশু আদালত গঠন করার কথা বলা হয়। এ ছাড়া শিশুদের জন্য উপযোগী আদালতের পরিবেশ, যেমন– ধারা ১৭(৪) অনুসারে, 'যে সকল দালান বা কামরায় এবং যে সকল দিবস ও সময়ে প্রচলিত আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় উহা ব্যতীত, যতদূর সম্ভব, অন্য কোনো দালান বা কামরায়, প্রচলিত আদালতের ন্যায় কাঠগড়া ও লালসালু ঘেরা আদালতকক্ষের পরিবর্তে একটি সাধারণ কক্ষে এবং অন্য কোনো দিবস ও সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ব্যতীত শুধু শিশুর ক্ষেত্রে শিশু-আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।' ধারা ১৫তে বলা আছে যে, প্রাপ্তবয়স্ক আসামির সঙ্গে কোনো শিশুকে অপরাধী করে একত্রে চার্জশিট দাখিল করা যাবে না। তবে প্রণীত হবার পরপরই আইনটি আদালতের মাধ্যমে কার্যকর করার বেলায় বেশ কিছু অসংগতি লক্ষ করা যায়। যেমন– আইনটির ১৭(১) ধারায় বলা আছে যে, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু কোনো মামলায় জড়িত থাকলে যে-কোনো আইনের অধীনেই হোক না কেন উক্ত মামলা বিচারের এখতিয়ার কেবল শিশু আদালতের থাকবে। আবার আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বলতে কী বোঝানো হচ্ছে তা বলা আছে আইনটির ২(৪) ধারায়। সেখানে বলা আছে যে, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু অর্থ এমন কোনো শিশু যে বিদ্যমান কোনো আইনের অধীনে কোনো অপরাধের শিকার বা সাক্ষী। এই দুই ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কোনো মামলায় বাদী, আসামি এবং

ঘটনায় অভিযুক্তরা হলো বাসের চালক হাবিব, সুপারভাইজার সফেদ আলি, বাসের সহকারী শামীম, আকরাম ও জাহাঙ্গীর। অভিযুক্তদের সবাই অপরাধ স্বীকার করেছে।

রায় ঘোষণাসহ মামলা পরিচালনার পুরো প্রক্রিয়াটিই গুরুত্বপূর্ণ ও দৃষ্টান্তমূলক। মাত্র ১৪ কর্মদিবসে এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত বাসটির মালিকানা রূপার পরিবারকে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। কোনো মৃত্যুই পূরণযোগ্য নয়। কিন্তু একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে পরিবারটির আর্থিক অনিশ্চয়তা মেটাতে এই ক্ষতিপূরণ গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি নিরাপদ পরিবহণসেবা নিশ্চিত করতে পরিবহণ মালিক ও শ্রমিকদের যৌথ দায়দায়িত্বের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সজাগ করতেও এই ক্ষতিপূরণের আদেশটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায় যে, আদালত তাঁর পর্যবেক্ষণে মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নকে এ রকম দায়িত্বশীলতার মধ্যে আনলে তারা পরিবহণ শ্রমিকদেরকে অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখতে বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য যে, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর আউটরিচ লিগ্যাল এইড প্রোগ্রাম থেকে মামলাটি পরিচালনায় সরকারপক্ষকে সহায়তা করা হয়। এই মামলার তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত পুলিশ, স্বাস্থ্য প্রশাসন, আইনজীবী, বিচারকসহ প্রত্যেকের দায়িত্বশীল ও সমন্বিত প্রচেষ্টায় মামলাটির বিচার কার্যক্রম স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখ করতেই হয় যে, এই রায়ে সংশ্লিষ্ট বিচারকের প্রজ্ঞা ও নারীর প্রতি সংঘটিত সহিংসতা বিষয়ের প্রতি তার গভীর সংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। বিচারক রায়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। এবং নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, যা সরকার, পরিবহণ মালিক-শ্রমিক সমিতি, গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সবার আমলে নেয়া প্রয়োজন।

আমরা এই রায়ের দ্রুত বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করি। পাশাপাশি রূপার মামলার মতো অন্যসব ধর্ষণ ও হত্যা মামলারও দ্রুত বিচার দাবি করছি। তা ছাড়া এই রকম দৃষ্টান্তমূলক রায়ের সুফল পেতে এই রায়ের ব্যাপক প্রচারেরও প্রয়োজন রয়েছে, যা এই মামলার বিচারক তার পর্যবেক্ষণেও বলেছেন। ■

সাক্ষীদের যে-কোনো একজন শিশু হলে শিশু আদালত মামলাটির বিচার করবে। অর্থাৎ বাদী এবং আসামি উভয়ই প্রাপ্তবয়স্ক হলেও কোনো একজন সাক্ষীর বয়স যদি ১৮ বছরের কম হয়, তাহলে মামলাটি শিশু আদালতে বিচারযোগ্য হবে। এর ফলে শিশু আদালতে মামলার জট দেখা দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অসাধু ব্যক্তিগণ অন্যায় সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে মামলার কোনো একজন শিশু সাক্ষীকে এনে মামলাটি শিশু আদালতে বিচারের এখতিয়ারাধীন বলে দাবি করতে পারে এবং অপর পক্ষের জন্য তা ভোগান্তি সৃষ্টির কারণ হতে পারে। অর্থাৎ, আইনটির অপব্যবহার করারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সর্বশেষ ঘটনা উইলস্ লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার রিশাকে মো. ওবায়দুল হক (২৯) নামক এক দর্জির (টেইলর কাটিং মাস্টার) ছুরিকাঘাত। প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ায় গত ২৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে স্কুল থেকে ফেরার পথে মো. ওবায়দুল হক উইলস্ লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ফুটওভারব্রিজের ওপর ধারালো ছুরি দিয়ে রিশার পেটে এবং হাতে মারাত্মকভাবে জখম করে পালিয়ে যায়। এরপর রিশাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রিশার মা বাদী হয়ে গত ২৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে মো. ওবায়দুল হককে (২৯) একমাত্র আসামি করে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ২৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রিশা মারা গেলে ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে আসামি মো. ওবায়দুল হককে পুলিশ গ্রেফতার করে। ১৩ নভেম্বর পুলিশ চার্জশিট দাখিল করে। ইতিপূর্বে আসামি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। পরে মহানগর অতিরিক্ত দায়রা জজ ৮ম আদালতে বিচারকাজ শুরু হয়। উক্ত মামলায় প্রত্যক্ষদর্শী দুই সাক্ষী শিশু, যাদের বয়স ১৮ বছরের কম, এমন অজুহাতে আসামিপক্ষ মামলাটি শিশু আদালতে বদলির আবেদন করে। এরপর মামলাটি শিশু আদালতে বিচারের জন্য বদলি হয়ে আসে। বর্তমানে মামলাটি প্রথম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ ও শিশু আদালত, ঢাকায় বিচারাধীন আছে।[১] এ ছাড়া শিশুকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে ঢাকা, কক্সবাজার ও রংপুরে করা পৃথক চার মামলায় বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক চার আসামি হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানায়। চারটি মামলার মধ্যে দুটি শিশু আইনে ও অপর দুটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে করা হয়। পৃথক দুই আইনে দায়ের হওয়া মামলার সাজাও আলাদা।[২]

উল্লেখ্য যে, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) পরিচালিত বর্তমানে একটি মামলা পটুয়াখালী শিশু আদালতে চলমান। এই মামলাতেও ভিকটিম শিশু, আসামি তারই পিতা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। শিশু আদালতে মামলাটি বদলি হওয়ায় আসামিপক্ষ বিশেষ সুবিধা পাবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে।

শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় আসামি প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার বিচার কোন আইনে বা কোন আদালতে হবে– সে বিষয়ে ২০১৬ সালের ১৪ আগস্ট তিন সচিবের কাছে ব্যাখ্যা চান হাইকোর্ট। দুই সপ্তাহের মধ্যে তাদের ওই ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়। কিন্তু আড়াই মাসেও তারা ব্যাখ্যা দাখিল করেননি। শিশু আইনের অসংগতি দূরীকরণের বিষয়ে যথাসময়ে আদালতে ব্যাখ্যা দাখিল না করায় ৩১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে আইনসচিবসহ সরকারের তিন সচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করেন হাইকোর্ট। রুলে আদালতের আদেশ অমান্য করায় তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়া হবে না তা জানতে চাওয়া হয়েছে। তিন সপ্তাহের মধ্যে তিন সচিবকে এর জবাব দিতে বলা হয়েছে। আইনসচিব আবু সালেহ শেখ মোহাম্মদ জহিরুল হকের পাশাপাশি অন্য দুই সচিব হলেন একই মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও ড্রাফটিং উইংয়ের সচিব মো. শহিদুল হক ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব। বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি জে বি এম হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। এ সময় তিন সচিবের পক্ষে মো. মোজাম্মেল হক সময় চেয়ে আবেদন করেন। আবেদন দেখে আদালত বলেন, আড়াই মাসেও কেন তারা জবাব দাখিল করতে পারলেন না। শিশু আইনের অসংগতির কারণে বিচারিক আদালতে মামলার নিষ্পত্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।[৩]

অস্পষ্টতা নিরসনে শিশু আইন সংশোধনে সর্বশেষ অগগতির বিষয় জানাতে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও ড্রাফটিং উইংয়ের সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হক ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জিল্লার রহমানকে গত ২৯ অক্টোবর, ২০১৭ তলবের আদেশ দেন হাইকোর্ট। ওই তলব আদেশে ১২ নভেম্বর ২০১৭ বিকেলে তারা আদালতে হাজির হন। এ পর্যায়ে আদালত বলেন, 'আমরা দেখছি, শুধুই চিঠি চালাচালি হচ্ছে। কিন্তু কেন আইনটি সংশোধন হচ্ছে না?' এ সময় সচিব সহিদুল হক আইন সংশোধন না করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে আদালতে বলেন, আইন সংশোধনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তবে এর আগেই আইন সংশোধন হলে ভালো হতো। কিন্তু তা হয়নি।

সচিব বলেন, আইনের ১৭ নম্বর ধারাটাই মূলত সমস্যা। এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। এ সময় সচিব বলেন, আইন সংশোধনের জন্য দুই মাস সময় দরকার। এরপর সমাজকল্যাণ সচিব আদালতকে জানান, আমরা আইন সংশোধনের একটি খসড়া ভেটিং-এর জন্য গত ৭ মে পাঠিয়েছি আইন মন্ত্রণালয়ে। এখনো সেটা ফেরত আসেনি। আমাদের কাছে ফেরত আসার পর সাত দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত করতে পারব।

আদালত বলেছেন, শিশু আদালত এখন বয়স্কদের আদালতে পরিণত হয়েছে। ভিকটিম শিশু। অথচ বিচার হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কদের। আমাদের প্রত্যাশা, আইনের অস্পষ্টতা দূর করা। আদালত আরো বলেছেন, শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় আসামি প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার বিচার কোন আইনে বা কোন আদালতে হবে, তা স্পষ্ট করতে হবে।[৪] এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত আগামী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দিয়ে আদেশ দেন। যে সকল মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে শিশু আইন প্রণীত হয়েছে সেগুলোর সুফল পেতে আইনটির অস্পষ্ট বিষয়গুলো সংশোধনের মাধমে স্পষ্ট হওয়া অতীব জরুরি। ■

**তথ্যসূত্র**

১. দৈনিক *সংবাদ*, ২৯ অক্টোবর ২০১৭
২. দৈনিক *যুগান্তর*, ১২ নভেম্বর ২০১৭
৩. দৈনিক *যুগান্তর*, ১ নভেম্বর ২০১৬
৪. দৈনিক *প্রথম আলো*, ১২ নভেম্বর ২০১৭

# মারমা তরুণী ও তনু হত্যা ধর্ষণ মামলা

**সুবর্না ধর**

আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৮ উদ্‌যাপনে জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য হলো– Time is Now: Rural and urban activists transforming womens lives। এই বিষয়কে ঘিরে বাংলাদেশ সরকারও এবারকার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে– 'সময় এখন নারীর : উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্মজীবনধারা।' বিগত কয়েক দশকে দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র এই প্রতিপাদ্যকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের বিপরীতে চলমান বিচারহীনতার সংস্কৃতি নারীর জীবন-স্বাধীনতা-আইনের দৃষ্টিতে সমতা-ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকারকে সংকীর্ণ করে তুলছে।

নারীর প্রতি যৌন সহিংসতা, নির্যাতন, ধর্ষণ দেশে এখন প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা। একই সঙ্গে স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে এসব নির্যাতন-সহিংসতার জন্য দায়ীদের বিচার না হওয়াও। এখনো ধর্ষণ, হত্যার মতো ঘটনার বিচারের জন্য দেশের নাগরিককে পথে নামতে হয়, আন্দোলন করতে হয়। কিন্তু বিচার পাওয়ার আশা ক্ষীণই থেকে যায়। সেই ক্ষীণ আশায় ভর করে কেউ কেউ ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করে যায়, কেউ আবার লড়াই করার সুযোগও পায় না।

সম্প্রতি, রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলার গ্রাম ওরাছড়িতে ধর্ষণের ও যৌন নির্যাতনের শিকার দুজন মেয়ে মূলত বিচার চাওয়ার ও অধিকারবঞ্চিত নারীদের সংখ্যায় যুক্ত হয়েছেন। গত ২১ জানুয়ারি, সেনাবাহিনী ও আনসারের যৌথ অভিযান চলাকালে একজন মারমা নারী অভিযানের সদস্যদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন এবং তার ছোট বোন যৌন নির্যাতনের শিকার হন। এই ঘটনায় একজন আনসার সদস্যকে 'ক্লোজড' করা হয়। ২৩ জানুয়ারি দুপুরে তাদের রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্স সে সময় ধর্ষণের শিকার বড় বোনের শারীরিক অবস্থা ভালো নয় বলে মন্তব্য করেন এবং তখন পর্যন্ত তার রক্তক্ষরণ হচ্ছিল বলে আসক-এর তথ্যানুসন্ধান কর্মীকে জানান। গত ৩১ জানুয়ারি রাঙ্গামাটি সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে মেয়ে দুজনের মেডিক্যাল প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়। এই প্রতিবেদনে ঘটনার শিকার মেয়েদের শরীরে ধর্ষণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়। তবে, এই প্রতিবেদন প্রকাশের আগেই ২৪ জানুয়ারি বিলাইছড়ির একজন স্থানীয় প্রভাবশালী মেয়ে দুজনের বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন– মেয়ে দুজনকে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকরা তুলে নিয়ে নির্যাতন করেছে এবং সেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পোশাক পরা কেউ ছিল না। কিন্তু সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত মেয়েদের ছোট ভাই (৮), যে ঘটনার দিন তার বোনদের সঙ্গে একই রুমে ছিল, সে জানায়, রাতে আর্মির পোশাক পরা লোককেই দেখেছে। সে আরো বলে, তারা আলো জ্বালাতে নিষেধ করে ও চুপ থাকতে বলে। অন্যদিকে, ২৫ জানুয়ারি ডয়েচ ওয়ে'র একটি প্রতিবেদনে গণমাধ্যমকর্মী ও মানবাধিকারকর্মীদের নির্যাতিত মেয়ে দুজনের সঙ্গে দেখা করতে বাধা দেয়া হয় বলে উল্লেখ করা হয়। ওই প্রতিবেদনে জানা যায়, চাকমা সার্কেল চিফ রাজা দেবাশীষ রায়, তার স্ত্রী রানি ইয়ান ইয়ান ও মানবাধিকার কমিশনের সদস্য বাঞ্ছিতা চাকমাকে মেয়ে দুজনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রথমে তাদেরও বাধা দেওয়া হয়। এরপর পুলিশের উপস্থিতিতে তাদেরকে মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয়। দুই বোনের মধ্যে বড় বোন মারমা ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা জানেন না আর ছোটজন অল্প কিছু বাংলা বলতে পারেন। কিন্তু সাক্ষাৎকালে রানি ইয়ান ইয়ানকে মেয়েদের সাথে বাংলায় কথা বলতে বলা হয়। কর্তব্যরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এ ধরনের আচরণ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে পরবর্তী সময়ে মারমা ও অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীকে মেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য তাদের সঙ্গে থাকার অনুমতি দেয়া হয়।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর তথ্যানুসন্ধানকালে জানা যায়, হাসপাতালে থাকাকালীন মেয়েদের সঙ্গে তাদের বাবা-মার যোগাযোগ ছিল না। উপরন্তু শুধু সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিতি ছাড়া তারা একরকম নিখোঁজ ছিলেন। এর মধ্যে গ্রামে নিরাপত্তাসংকটের কথা উল্লেখ করে মেয়েরা চাকমা রানির তত্ত্বাবধানে হাসপাতাল ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে রাঙ্গামাটির সিভিল সার্জনকে আবেদন

জানান। আবেদনের অনুলিপি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-সহ বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠনকেও দেয়া হয়। কিন্তু, চিকিৎসা শেষ হওয়ার পরও তাদের হাসপাতালে প্রায় এক বছর আগে থেকে পরিত্যক্ত গাইনি ওয়ার্ডে পুলিশের কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হয়।

৮ ফেব্রুয়ারি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালসহ ছয়জন বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী উচ্চ আদালতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। এই পিটিশনে ওড়াছড়ি গ্রামে নির্যাতনের শিকার মেয়ে দুজনের নিরাপত্তাসংকট এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হবার আশঙ্কা এবং তাদের মতামত বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে রানি ইয়ান ইয়ানের জিম্মায় দেয়ার আবেদন জানানো হয়। আদালত পিটিশনটি এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখেন। অন্যদিকে, ১২ ফেব্রুয়ারি, উচ্চ আদালতের পৃথক একটি বেঞ্চে মেয়েদের বাবা উসেসিং মারমা তাদেরকে নিজের জিম্মায় নেওয়ার দাবি জানিয়ে আরেকটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। এই পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে, ১৩ ফেব্রুয়ারি আদালত মেয়েদের হাসপাতাল থেকে বাবা-মায়ের জিম্মায় দেয়ার রায় প্রদান করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টা নাগাদ, সাদা পোশাকধারী পুলিশের পক্ষ থেকে মেয়েদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাসপাতাল ত্যাগে বাধ্য করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি *দ্য ডেইলি স্টার*-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, এই সময় উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবী ও চাকমা রানি ইয়ান ইয়ানের ওপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা হামলা চালায়। অন্যদিকে, ২৮ ফেব্রুয়ারি আলজাজিরার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, মেয়েদের বাবা-মার জিম্মায় দেয়ার কথা থাকলেও তাদের রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের সাবেক এক সদস্যের জিম্মায় তার বাড়িতে রাখা হয় বলে জানা গেছে। এসব ঘটনার মধ্যে মাস পেরিয়ে গেলেও ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি। সর্বশেষ, ঘটনার প্রায় এক মাস পর ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ, কমিশনের সদস্য অধ্যাপক বঞ্চিতা চাকমাকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

দেশের এ চলমান বিচারহীনতার বিপরীতে যারা বিচার পাওয়ার আশা নিয়ে আইনগতভাবে ও সামাজিকভাবে লড়াই করে যাচ্ছেন, তাদের লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। তাদের অবস্থা আমরা তনুর ঘটনায় দেখতে পাই। প্রায় দুই বছর ধরে মেয়ের ধর্ষণ ও হত্যার বিচারের অপেক্ষায় থাকা তনুর বাবা-মার কাছে ন্যায়বিচার যেন ক্রমে দুরাশায় পরিণত হচ্ছে।

সোহাগি জাহান তনু ছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী। যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। বাবার চাকরি সূত্রে কুমিল্লা সেনানিবাসস্থ পাওয়ার হাউজ আবাসিক এলাকায় থাকতেন। ২০ মার্চ ২০১৬, প্রাইভেট পড়ানোর উদ্দেশ্যে সেনানিবাস এলাকার আলিপুর স্টাফ কোয়ার্টারে যান। অনেক রাত হয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি ফিরে না আসায় খুঁজতে গিয়ে বাড়ির পাশে সেনানিবাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে আনুমানিক ৩০০/৪০০ দূরে কালভার্টের নিচে জঙ্গলে তনুকে দেখতে পান তনুর বাবা। তাৎক্ষণিকভাবে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের পর তনুর লাশ দাফন করা হয় তার গ্রামের বাড়িতে। এই ঘটনায় ২১ মার্চ ২০১৬ তারিখে তনুর বাবা অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ৬৫, তারিখ : ২১/০৩/২০১৬।

প্রথম দফা ময়নাতদন্তে মৃত্যুর সুস্পষ্ট কোনো কারণ উল্লেখ না করে প্রতিবেদন দেয় কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগ এবং তনুর শরীরের বিভিন্ন জখমের উল্লেখ প্রতিবেদনে ছিল না বলে জানা যায়। এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে ৩০ মার্চ ২০১৬ পুনরায় ময়নাতদন্তের জন্য তনুর মরদেহ উত্তোলন করা হয়। পুনঃ তদন্তের পরও মৃত্যুর সুস্পষ্ট কোনো কারণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেনি কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগ। ১ এপ্রিল ২০১৬ সিআইডি মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব নেয়।

গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, ২০১৬-র মে মাসে দায়িত্বরত তদন্ত-তদারক কর্মকর্তা সিআইডির কুমিল্লার বিশেষ পুলিশ সুপার নিশ্চিত করেন, তনুর জামা-কাপড় থেকে নেয়া নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা করে তনুকে হত্যার আগে ধর্ষণের আলামত পাওয়া যায়। কিন্তু তনুর পরিবার প্রথমদিকেই সিআইডিকে যে তিনজন সন্দেহভাজনের পরিচয় দিয়েছিল, তাদের ডিএনএ ম্যাচিং করা হয়েছে কি না তা এখনো জানা যায়নি। তদন্তের শুরুর দিকে সিআইডি এই বিষয়ে তৎপরতা দেখালেও তার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় না। ঘটনার পর ২৩ মাস কেটে গেছে, এখনো শনাক্ত হয়নি দায়ী ব্যক্তি, নেই মামলার কোনো অগ্রগতি। ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করতে থাকা তনুর বাবা-মার মনে সন্দেহ জাগে– বিচার আদৌ পাব তো! হয়তো তাদের মনে প্রশ্ন জাগে, ঘটনাস্থলটি যদি কুমিল্লা সেনানিবাস না হতো, দোষীদের শনাক্ত করার নামে সময়ক্ষেপণ করা না হতো, তাহলে কি রূপার মতো তনু হত্যার বিচারও পাওয়া যেত!

কিন্তু, এটিই বাংলাদেশে নারী অধিকারের বাস্তবতা। এইখানে অধিকারের বিপরীতে মুখ্য হয়ে ওঠে ঘটনার স্থান, অভিযুক্ত সন্দেহভাজনদের পরিচয়। আর এ রকম এক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে আরেক বাবা হযরত আলী তার আট বছরের কন্যাকে নিয়ে আত্মঘাতী হন। ২০১৭ সালের ৩০ এপ্রিল, ডেইলি স্টার সূত্রে জানা যায়, গাজীপুরের শ্রীপুরে হযরত আলী শিশুকন্যার শ্লীলতাহানির বিচার চেয়ে পান না, বেঁচে থেকেও সন্তানকে নিরাপত্তা দিতে না পারায় বিপন্ন বোধ করেছিলেন। পরে, শ্রীপুর রেল স্টেশনের পশু হাসপাতাল-সংলগ্ন এলাকায় দেওয়ানগঞ্জগামী তিস্তা ট্রেনের নিচে শিশু কন্যাসহ কাটা পড়েন তিনি। ■

**তথ্যসূত্র**


১. http://www.thedailystar.net/star-weekend/human-rights/rape-marma-sisters-1528471
২. http://www.newagebd.net/article/35252/index.php
৩. http://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2018/01/26/marma-sisters-raped-sexually-assaulted-rangamati/
৪. http://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2018/01/27/marma-sisters-shifted-icu/
৫. https://www.youtube.com/watch?v=R62vVr6wMrI
৬. http://www.thedailystar.net/frontpage/rangamati-rape-victims-handed-over-parents-1535377
৭. https://www.aljazeera.com/news/2018/02/bangladesh-minorities-bid-cover-army-sex-assault-180217110336276.html

## নিম্ন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধির গেজেট

# বিচার বিভাগ পৃথক্করণে এক ধাপ অগ্রগতি

**মাবরুক মোহাম্মদ**

সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রেখে অধস্তন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিধিমালার গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার। গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ 'বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা-২০১৭' নামে বহুল আলোচিত এই গেজেট প্রকাশ করা হয়। এতে ব্যবস্থা নেয়ার 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' হিসেবে রাষ্ট্রপতি বা আইন মন্ত্রণালয়কে বোঝানো হয়েছে।

সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালতগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার বিষয়ে বলা হয়েছে। ওই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিচার বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার বিধান রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি তা প্রয়োগ করবেন। মূলত সংবিধানের এই বিষয়টিই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে স্থান পেয়েছে বিধিমালায়। গেজেট প্রকাশের তারিখ, অর্থাৎ ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ থেকেই এটা কার্যকর হয়েছে।

বাহাত্তরের সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদে বলা ছিল, অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি, কর্মস্থল নির্ধারণ, ছুটি ও শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয়গুলো সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। রাষ্ট্রপতি বা আইন মন্ত্রণালয়ের কোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল না। পদত্যাগ করা প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বাহাত্তরের ওই বিধান ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। সাবেক প্রধান বিচারপতি ওই বিধিমালার খসড়ার বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে সরকারকে ফেরতও পাঠান। পরে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহ্হাব মিঞার সঙ্গে আইনমন্ত্রীর আলোচনার পর বিধিমালাটি চূড়ান্ত করা হয়।

### বিধিমালায় যা আছে

বিধিমালায় বলা হয়েছে, জুডিশিয়াল সার্ভিসের কোনো সদস্য প্রেষণে কর্মরত থাকাকালে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে রাষ্ট্রপতি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ প্রাথমিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিষয়টি নিরূপণের চেষ্টা করবে। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শে তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

সার্ভিসের কোনো সদস্যকে অভিযোগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ না দিয়ে এবং ব্যাখ্যার পর সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ ছাড়া অভিযোগ আনা বা অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা নিরূপণের পদক্ষেপ বা বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম শুরু করা যাবে না। অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত বক্তব্য (যদি থাকে) বিবেচনার পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন, তাহলে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শে অনুসন্ধান কর্মকর্তা নিয়োগ করবে।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছাড়া অন্য কোনো মন্ত্রণালয় বা সংস্থায় প্রেষণে থাকার সময় কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ওই কর্মকর্তাকে আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তদন্ত শেষ করতে হবে। সার্ভিসের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করার সময় বা পরবর্তী যে-কোনো পর্যায়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে। সাময়িক বরখাস্তের এক বছরের মধ্যে তদন্ত শেষ করে বিভাগীয় মামলায় চূড়ান্ত আদেশ দিতে হবে। বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত হলে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শে নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে বিভিন্ন ধরনের দণ্ড দেয়া যাবে।

### আইনজীবীদের বিভক্তি

জারীকৃত শৃঙ্খলাবিধি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থক আইনজীবীরা গত ৫ জানুয়ারি ২০১৮ পালটাপালটি বিবৃতি প্রদান করেন।[১] অধস্তন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি-সম্পাদকসহ বিএনপি-সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের নেতৃত্বে সমিতি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সংবাদ সম্মেলনে সমিতির সভাপতি জয়নুল আবেদীন বলেন, নিম্ন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধিমালার গেজেট গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের দেয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। কারণ আপিল বিভাগ যখন কোনো রায় দেন, তখন তা মান্য করা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। তিনি আরো বলেন, বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু শৃঙ্খলা বিধিমালার যে গেজেট প্রণীত হয়েছে, তাতে সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাই আইন মন্ত্রণালয়ের প্রভাবমুক্ত একটি বিচার বিভাগীয় সচিবালয় স্থাপনপূর্বক ফের গেজেটটি সংশোধিত আকারে প্রকাশ করে তা আপিল বিভাগে উপস্থাপনের জন্য সরকারের প্রতি তিনি দাবি রাখেন। তিনি বলেন, বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় আইন মন্ত্রণালয়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীলতা রয়ে গেছে। কারণ আইন মন্ত্রণালয়ই সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে। এ কারণে পৃথক সচিবালয় দরকার বিচার বিভাগের জন্য।

এরপর আওয়ামী-সমর্থক অংশের নেতা সমিতির সহসভাপতি মো. ওয়াজি উল্লাহর নেতৃত্বে ল' রিপোর্টার্স ফোরাম কার্যালয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন হয়। সম্মেলনে তিনি বলেন, বিচারকদের

শৃঙ্খলাবিধিমালার গেজেট আপিল বিভাগ কর্তৃক গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মাসদার হোসেন মামলার রায়ের পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ওই গেজেটে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শকে প্রাধান্য দেয়ায় এটাকে বিতর্কিত করার আর কোনো সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, সর্বোচ্চ আদালত গেজেট গ্রহণ করায় তা সংশোধনের সুযোগ নেই। এর পরও গেজেট সংশোধনের দাবি জানানো আদালত অবমাননার শামিল। আপিল বিভাগ কর্তৃক গেজেট গ্রহণের পর অধস্তন আদালতের বিচারকদের সংগঠন জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে। এ ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের জন্য পৃথক রুলস রয়েছে। এ রুলস পরিবর্তন ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়োজন নেই।

**গেজেট নিয়ে আইনজ্ঞদের মতামত**

বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধির গেজেট প্রকাশের প্রতিক্রিয়ায় সংবিধান ও আইন বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার এম আমীর-উল ইসলাম বলেছেন, জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনকে সরকার আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, 'সংবিধান যে ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করেছে সেই জায়গায় রাষ্ট্রপতির স্থানে আইন মন্ত্রণালয় প্রতিস্থাপিত হতে পারে না। রাষ্ট্রপতির ভূমিকা আইন মন্ত্রণালয় পালন করতে পারে না।' তিনি আরো বলেন, 'বিচারিক আদালত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। তাদেরকে সরকারি গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা সঠিক হয়নি।'

সংবিধানপ্রণেতাদের অন্যতম এই সদস্য বলেন, 'মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে এবং সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিচারিক আদালতকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু এ গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সে জায়গা থেকে সরে গেছে সরকার। এর মাধ্যমে বিচারিক আদালতের নিয়ন্ত্রণ আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থেকেই গেছে।'

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, সিনিয়র আইনজীবী ও সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, 'নিম্ন আদালতের বিচারকদের চাকরির যে শৃঙ্খলাবিধি সরকার তৈরি করেছে তা সম্পূর্ণ আত্মঘাতী, অর্থহীন এবং অসাংবিধানিক।' তিনি বলেন, 'এই শৃঙ্খলাবিধি সম্পূর্ণভাবে সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থি। এর মধ্য দিয়ে নিম্ন আদালতের বিচারকগণ সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল।' তিনি বলেন, 'এই শৃঙ্খলাবিধির মাধ্যমে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের মৃত্যু ঘটেছে। মাসদার

# আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী (দ্রুত বিচার) আইন সংশোধনী

**সমীর কর্মকার**

জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বিগত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুতবিচার) সংশোধন আইন, ২০১৮ বিলটি পাস হয়েছে। যার মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী কতিপয় অপরাধের বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি করা উদ্দেশ্যে ২০০২ সালের প্রণীত বিলটিতে সংশোধনী আনা হয়েছে। বিদ্যমান আইনের ৪ ধারায় আগে সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদ ছিল ৫ (পাঁচ) বছর, সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাড়িয়ে ৭ (সাত) বছর করা হয়েছে। একই সঙ্গে আইনের ধারা ৮-এর উপধারা (২)-এ বিচারের এখতিয়ার পরিবর্তন করে বিচারের ভার বিশেষভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এর আগে শুধু প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনার বিধান ছিল। বর্তমান সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারককে বিশেষভাবে ক্ষমতায়িত করা হলো। দ্রুত বিচার আইনে শুধু 'আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী' অপরাধের বিচার করা হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ছাড়াও আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধের শিকার ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান এই আইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। আইনের ২ ধারায় 'আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী' অপরাধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সর্বসাকুল্যে মোট ৮ ধরনের অপরাধকে এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে– (১) কোনো ব্যক্তি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে চাঁদা, বা অন্য কোনো নামে অর্থ বা মালামাল দাবি, আদায় করা বা অন্য কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় বা আদায়ের চেষ্টা করা; (২) স্থলপথ, রেলপথ, জলপথ বা আকাশপথে যান চলাচলে বিঘ্ন করা বা কোনো চালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যানের গতি ভিন্ন পথে পরিবর্তন করা; (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো যানবাহনের ক্ষতিসাধন করা; (৪) ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর যে-কোনো প্রকার সম্পত্তি বিনষ্ট বা ভাঙচুর করা; (৫) কোনো ব্যক্তির নিকট হতে কোনো অর্থ, অলংকার, মূল্যবান জিনিসপত্র বা অন্য কোনো বস্তু বা যানবাহন ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা বা ছিনতাই করা; (৬) কোনো স্থানে পরিকল্পিতভাবে বা আকস্মিকভাবে একক বা দলগতভাবে শক্তি প্রয়োগ করে ভয়ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি করা বা বিশৃঙ্খলা বা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা; (৭) কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দরপত্র ক্রয়-বিক্রয়ে বাধা প্রদান; (৮) কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তা বা তার কোনো নিকটাত্মীয়কে ভয়ভীতি দেখিয়ে কোনো কাজ করতে বাধ্য করানো। যদিও এই আইনের মাধ্যমে যে সকল অপরাধকে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই প্রচলিত আইনে বিচার করা সম্ভব।

এই আইনের ১০ ধারা ৪ উপধারা অনুসারে বিচারকার্য দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরের ৩০ বা ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে

হোসেন মামলায় বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ করা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশ ছিল এটি তার পরিপন্থি।'

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, উচ্চ আদালতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা কোথাও ক্ষুণ্ন করা হয়নি, বরং একটু বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি বলেন, যেখানে রাষ্ট্রপতি এবং সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শের মধ্যে ভিন্নতা থাকবে, সেই ভিন্নতা থাকলে সুপ্রিম কোর্টের যে পরামর্শ, সেটি প্রাধান্য পাবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা তো সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করি নাই।'

অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেছেন, সংবিধানের ১১৬ অনুযায়ী জুডিশিয়াল সার্ভিস রুল বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্ন আদালতের বিচারকদের চাকরিসংক্রান্ত বিধিমালার গেজেট প্রকাশ হওয়ায় একটি বিব্রতকর অবস্থার সমাপ্তি হয়েছে। সাবেক আইনমন্ত্রী সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেছেন, 'বিলম্ব হলেও গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে কিছুটা ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। বিধি প্রকাশের পর ভুল-বোঝাবুঝির আর কোনো অবকাশ নেই।' সিনিয়র এই আইনজীবী বলেন, আইন বা বিধি তো বাইবেল নয় যে পরিবর্তন করা যাবে না। এটার অসুবিধা আছে মনে হলে তা সংশোধন করা যেতে পারে বলেও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

## জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বিবৃতি

জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ এস এম কুদ্দুস জামান ও মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) বিকাশ কুমার সাহা ৩ জানুয়ারি ২০১৮ একটি বিবৃতি দেন।[২] দেশের শীর্ষ ছয়জন আইনজীবী মাসদার হোসেন মামলাকে রাজনীতিকরণের অপচেষ্টায় লিপ্ত আছেন বলে বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রফিক-উল হক, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, অ্যাডভোকেট এ এফ হাসান আরিফ, ব্যারিস্টার ফিদা এম কামালসহ ছয়জন আইনজীবী অধস্তন আদালতের বিচারকদের জন্য প্রণীত শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৭ সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন তা অ্যাসোসিয়েশনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালাকে গ্রহণ করেছেন এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের মধ্যে এই বিধিমালার বিষয়ে কোনোরূপ অসন্তোষ নেই, সেহেতু বিবৃতিদানকারী আইনজীবীদের উক্ত বিষয় নিয়ে নেতিবাচক সমালোচনা না করার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, শৃঙ্খলা বিধিমালাটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং আপিল বিভাগ তা গ্রহণ করেছে বিধায় এ বিধিমালার বিষয়ে সকলকে অনুরূপ নেতিবাচক মন্তব্য বা বিবৃতি প্রদান না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েশন। একই সঙ্গে ড. কামাল হোসেন ও এম আমীর-উল ইসলামকে মাসদার হোসেন মামলা পরিচালনার জন্য যে ক্ষমতা (ওকালতনামা) অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা প্রদান করেছিলেন তা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

## প্রয়োগই এখন জরুরি

অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলাবিধি প্রণয়ন নিঃসন্দেহে বিচার বিভাগ পৃথক্‌করণের পথে একটি বড় অগ্রগতি। তবে এটি নিয়ে রাজনৈতিক কারণে জল ঘোলা করা অনুচিত। এটি নিয়ে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি আরো উন্নততর করার বিষয়ে আলোচনা করা যেতেই পারে। তবে কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো মন্তব্য থেকে বিরত থাকা দরকার। রাজনীতি পরিবর্তনশীল। কিন্তু বিচার বিভাগের স্বাধীনতা একটি স্থায়ী বিষয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আজকের সংশ্লিষ্ট পক্ষদের ভূমিকাও বদলে যেতে পারে। তাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়ে মনোযোগী হলে এর সুফল সবাই পেতে পারে। একই সঙ্গে এটাও আমাদের মনে রাখা দরকার যে, একটি ভালো আইনের খারাপ ব্যবহারের ফলে আইনটি বিতর্কিত হয়ে যেতে পারে। তাই যে শৃঙ্খলাবিধিটি আমরা পেয়েছি সেটির যথাযথ ও উপযুক্ত প্রয়োগই কাম্য। আশা করা যায় শৃঙ্খলাবিধিটির সদ্ব্যবহারই হবে ■

**তথ্যসূত্র**

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ জানুয়ারি ২০১৮

২. দৈনিক *সমকাল*, ৩ জানুয়ারি ২০১৮

---

সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে, যা প্রচলিত ফৌজদারি আইনে ১৮০ কার্যদিবসে সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে বিগত ২০০২ সালে দ্রুত বিচার আইন জারি করে ২ (দুই) বছরের জন্য তা কার্যকর করা হয়। ফলে ২০০৪ সালেই আইনটি বিলুপ্ত হবার কথা ছিল। কিন্তু উক্ত সরকারের আমলে আইনের মেয়াদ বারো বছর পর্যন্ত বাড়ানো হয়। ২০১৪ সালে আইনটির মেয়াদ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা হয় বর্তমান সরকারের আমলে। বর্তমান সংশোধনীতে আইনটির কার্যকারিতার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে ২০১৯ সালের ৭ এপ্রিল পর্যন্ত দ্রুত বিচার আইন, ২০০২ কার্যকর থাকবে। আইন সংশোধনের কারণ ব্যাখ্যা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বলেন, 'আইনের ধারা ৪-এর উপধারা (১)-এ বিধৃত শাস্তির পরিমাণ কম থাকায় আইনটি সময়োপযোগীকরণ ও দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা-পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা ও অধিকতর উন্নতির লক্ষ্যে এ আইনের বিবৃত শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।'

তবে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই যে, শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে অপরাধ সংঘটনের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। নির্দিষ্ট মেয়াদি এই ফৌজদারি আইনে সাজার পরিমাণ বৃদ্ধি আইনটির ভবিষ্যৎ ব্যবহার কীরূপ হবে, তা নিয়ে জনমনে এক ধরনের শঙ্কার জন্ম দিয়েছে। তা ছাড়া ২০১৯ সালেই এই আইনের মেয়াদ শেষ হবে, এটা আশা করা যায় না। কারণ ২০১৯-এ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এই সংশোধনী আনয়ন, আইনটির প্রয়োগের মেয়াদ আরো দীর্ঘ হতে পারে– এমন বার্তাই দিচ্ছে। ■

**তথ্যসূত্র**

১. *প্রথম আলো*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

২. বিডি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৮ জানুয়ারি ২০১৮

যশোর রোড

# হুমকির মুখে দেশের বৃক্ষসমূহ

**জাকিয়া সুলতানা**

ছোটবেলার গল্পে পড়েছিলাম বটবৃক্ষের দুঃখ ছিল মানুষ তার ছায়াতলে বিশ্রাম নেয়, বাকল চেঁছে ক্ষত সৃষ্টি করে এবং যাবার সময় ডাল-পাতা ভেঙে নিয়ে যায়। বর্তমানে দেশের বড় বড় বৃক্ষসমূহকে এ দুঃখ করতে হচ্ছে না, কেননা উন্নয়নের নামে তাদের সম্পূর্ণরূপে কেটে ফেলে তাদের হত্যা করা হচ্ছে। সম্প্রতি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ নিলেই উদ্যোক্তাদের মাথায় চলে আসে ছায়া-সুনিবিড় শান্তির প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা দেশের বড় বড় বৃক্ষ নিধনের কথা। বৃক্ষ নিধন যেন তথাকথিত উন্নয়নের রোল মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছ নিধনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত তারই প্রমাণ বহন করে। প্রথমেই মনে পড়ে যশোর-বেনাপোল ৩৮ কিলোমিটারের এ সড়কের দুই পাশে থাকা শতবর্ষী হাজার হাজার বৃক্ষনিধনের সিদ্ধান্ত। যশোর-বেনাপোল মহাসড়কটি চার লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গত ৬ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যে শতবর্ষী বৃক্ষগুলো সৌন্দর্য বর্ধনের পাশাপাশি উল্লিখিত এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে, তা কেটেই সম্প্রসারণ করা হবে উল্লিখিত রাস্তাটি। এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা চলে দেশের গণমাধ্যমগুলোতে। অবশেষে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে ছয় মাসের জন্য রক্ষা পায় গাছগুলো। পরবর্তী সময়ে গাছ কাটার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে সরকার। যশোরের গাছগুলো রক্ষা পেলেও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় সড়ক উন্নয়ন, পাইপলাইন, গ্যাসলাইন স্থাপনসহ নানাবিধ উন্নয়নের নামে নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে দেশের বড় বড় বৃক্ষ। গত কয়েক মাসে রাস্তা সম্প্রসারণের অজুহাতে উত্তরাতে গণহারে চলছে বৃক্ষনিধন। নির্বিচারে গাছ কাটার বিরুদ্ধে ঢাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রতিবাদ করেছে, মানববন্ধন করেছে, তবুও রক্ষা পায়নি গাছগুলো। জানুয়ারি ২০১৭ সালে গাজীপুর বন বিভাগ কর্তৃক রোপিত প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে থাকা ১৩ হাজার গাছ কর্তনের অনুমতি দিয়েছে গ্যাসলাইন সম্প্রসারণের জন্য। পূর্বাচল আবাসিক প্রকল্পের প্লট তৈরি করতে ১২ লক্ষ গাছ কাটার উদ্যোগ

**দিল্লির আদালতের পর্যবেক্ষণ**

# নারীর শরীরের অধিকার একমাত্র তারই

**ফয়জুন্নেসা সীমা**

সম্প্রতি দিল্লির অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের বিচারক সীমা মাইনি ২০১৪ সালে দায়ের করা এক যৌন হয়রানির মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেন যে, নারীর শরীর একেবারেই তাঁর নিজের এবং তাঁর শরীরের প্রতি একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র তারই। অন্য কেউ কোনো অবস্থাতেই সম্মতি ছাড়া কোনো নারীর শরীর স্পর্শ করতে পারে না। বিকৃত মানসিকতার পুরুষ কর্তৃক নারীর প্রতি সংঘটিত যৌন হয়রানির ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, নারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারকে পুরুষেরা স্বীকার করে বলে মনে হয় না, এবং তাই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে নারীর, প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা ছোট শিশুর শরীর স্পর্শ করা অথবা যৌন হয়রানি করতে দুইবার তারা ভাবে না।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর মায়ের সঙ্গে উত্তর দিল্লির মুখার্জিনগরের কাছে একটি বাজারে গেলে নয় বছরের এক কিশোরীকে যৌন হয়রানি করে উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা ছবি রাম নামের এক পুরুষ। অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনায় মেয়েটি চিৎকার করে উঠলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অভিযুক্ত ছবি রাম। কিন্তু বাজারের লোকজনের সহায়তায় এই ব্যক্তিকে ধরে ফেলা হয়। এই মামলার রায়ে আদালত অভিযুক্তকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। কারাদণ্ডের পাশাপাশি তাকে ১০ হাজার ভারতীয় রুপি জরিমানা করা হয়, যার থেকে ৫

এভাবে গাছ কাটা হচ্ছে যত্রতত্র

নেয়া হয়েছে। গত অক্টোবর ২০১৭ তারিখে নির্বিচারে কেটে ফেলা হয় নাটোরের গণভবনের বৃহৎ আকারের বৃক্ষসমূহ। হাইওয়ে সম্প্রসারণের নামে ঠাকুরগাঁও শহর থেকে রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ৪.৩৪ কিলোমিটার এলাকার প্রায় ২০০টি প্রাচীন গাছ নিধন করা হয়েছে। সম্প্রতি মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর-হেমায়েতপুর রোডের দুই পাশে থাকা ৪ হাজার গাছ কাটার ওপর গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে আদালত স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। একইসঙ্গে আদালত গাছ কেটে রাস্তা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং গাছ রেখে রাস্তা সম্প্রসারণের পুনঃপরিকল্পনা কেন গ্রহণ করা হবে না, তা জানতে চেয়ে সরকারের প্রতি রুল জারি করেন। ২৫ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে *প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে এক আইনজীবীর দায়েরকৃত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ আদেশ প্রদান করেন।

শুধু গাছ নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের চরম হুমকিতে থাকা এ দেশকে যে বনভূমি রক্ষা করতে অগ্রসর ভূমিকা রাখতে পারে, সে বনভূমিও রক্ষা পাচ্ছে না তথাকথিত উন্নয়নের কবল থেকে। গত ২১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে 'সরকারের নজর বনের জমিতে' শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী বন বিভাগ এ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ৬৭ হাজার ৬৮৯ দশমিক ৪৯ একর বনভূমি বরাদ্দ দিয়েছে। প্রকাশিত এ সংবাদ অনুযায়ী ১৬ হাজার একর বনভূমি বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এ সংবাদে আরো উল্লেখ করা হয়েছে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য আশ্রয় শিবির গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ৪ হাজার ৮৩৫ একর বনভূমি। মহেশখালীতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ১৯১ একর সংরক্ষিত বনভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছে। এ বনভূমিতে নির্মাণ করা হবে একটি তেলের টার্মিনাল। উপকূলীয় চিংড়ি চাষের ফলে ধ্বংস করা হয়েছে উপকূলীয় বনভূমি।

বন ও গাছ নিধনের বর্তমান চিত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক-এ বর্ণিত রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে মর্মে ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং টেকসই উন্নয়নের বিরোধী।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে বনের গাছ কাটার ওপর নিষেধাজ্ঞা পরিপত্র থাকলেও সকল ধরনের গাছ কাটার ওপর দেশে নির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রদেশে গাছ কাটা নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ইত্যাদি সব দেশেই রয়েছে গাছ কাটা নিষিদ্ধসংক্রান্ত আইন রয়েছে। তাই সকল ধরনের বৃক্ষ রক্ষার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট আইন ও আইনের বাস্তবায়ন। ■

হাজার রুপি যৌন হয়রানির শিকার কিশোরীকে প্রদানের আদেশ প্রদান করা হয়। তা ছাড়া কিশোরীকে আরো ৫০ হাজার রুপি প্রদানের জন্য দিল্লি স্টেট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটিকে নির্দেশ প্রদান করেন।

শুধু ভারত নয়, আমাদের দেশেও নারীরা এমনকি কন্যা শিশুরাও জনসমাগমের স্থান, বিশেষ করে বাজার, মেলা, রাস্তাঘাট, বাস-ট্রেনের মতো গণপরিবহণগুলোতে বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয়। ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে বাসে ধর্ষণসহ বিভিন্ন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২১ জন নারী। এর মধ্যে চালক, হেলপার এবং তাদের সহযোগীদের দ্বারা গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে নয়টি। যাত্রী কল্যাণ সমিতির পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের সূত্র দিয়ে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি *সমকাল* পত্রিকায় এই পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে, যেসব ঘটনায় মামলা হয়েছে অথবা গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে শুধু সেসব ঘটনার ভিত্তিতেই এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এবং অনুমেয় যে, যৌন হয়রানির ঘটনার বেশিরভাগই অপ্রকাশিত থেকে যায়।

যৌন হয়রানিসহ নারীর প্রতি সংঘটিত সহিংসতা মূলত নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারের লঙ্ঘন। এবং এর পেছনে নারীকে পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের বস্তু হিসেবে গণ্য করা এবং নারীর শরীর নিয়ে যে-কোনো আচরণ করাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়ার মনস্তত্ত্বই বেশি দায়ী। যার জন্যই যৌন হয়রানিকারীদের এখনো পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বয়কট করা হয় না। এই প্রেক্ষাপটে নারীর শরীরের প্রতি নারীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা বিষয়ে দিল্লির বিচারক সীমা মাইনির পর্যবেক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নারীর প্রতি সংঘটিত যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির শাস্তি হওয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রয়োজন নারীকে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে ভাবা, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তথা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গোপনীয়তার অধিকারের স্বীকৃতি ও চর্চা গুরুত্বপূর্ণ। ■

# ঢাকার খাল রক্ষায় আদালতের নির্দেশনা

**জাকিয়া সুলতানা**

১৫২৮ বর্গকিলোমিটার (৫৯০ বর্গমাইল) আয়তনবিশিষ্ট বুড়িগঙ্গা নদীকে ঘিরে দেশের রাজধানী হিসেবে গড়ে ওঠা ঢাকা মহানগরী ১৬ মিলিয়ন লোকের আবাসভূমি। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী, পূর্বে বালু নদ, উত্তরে টঙ্গী খাল এবং পশ্চিমে তুরাগ নদ দিয়ে ঘেরা এ নগরীর অবস্থান দেশের কেন্দ্রবিন্দুতে। একসময় প্রাচ্যের ভেনিস এবং নদী-খালের শহর হিসেবে সমগ্র বিশ্বে বিশেষ পরিচিতি ছিল এ মহানগরীর। অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও তথাকথিত শিল্পায়ন আজ মহানগরীর সে পরিচয় সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়ে বিশ্বের বসবাস-অযোগ্য অন্যতম নগরীর পরিচয় প্রদান করেছে। অপরিকল্পিতভাবে দ্রুত প্রসারিত মেগাসিটিগুলোর মধ্যে বর্তমানে ঢাকা অন্যতম। যে বুড়িগঙ্গাকে ঘিরে এ নগরীর জন্ম, সে নদীকেই মেরে ফেলেছে এ নগরীর তথাকথিত উন্নয়ন ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ। শিল্পায়ন ও আবাসন বাণিজ্যের প্রসার একের পর এক গ্রাস করছে রাজধানী এবং এর আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নদী, খাল, নিচু জমি, কৃষিজমি, প্লাবনভূমি, উন্মুক্ত প্রান্তর, বন্যাপ্রবাহ এলাকা ও জলাশয়সমূহ। ফলে সুপেয় পানির জন্য নগরবাসীকে নির্ভর করতে হয় ভূগর্ভস্থ পানির ওপর। বর্তমানে রাজধানীর জন্য যে পানির প্রয়োজন তার ৮৭ শতাংশ উত্তোলন করা হয় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর থেকে।[১] প্রচুর পরিমাণ ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলনের ফলে প্রতিবছর তিন থেকে পাঁচ মিটার করে পানির স্তর নিচে নামছে।[২] ইতিমধ্যে রাজধানী ঢাকার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর স্থানভেদে প্রায় ০২-১০ মিটার নেমে গেছে।[৩] সত্তরের দশকে রাজধানীর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে এক মিটারেরও কম গভীরতায় ছিল, বর্তমানে সেখানে সর্বোচ্চ ৭০ মিটার পর্যন্ত নেমে গেছে।[৪] ফলে তীব্র পানির সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে ১৬ মিলিয়ন নগরবাসী। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ১২০ মিটার পর্যন্ত নেমে যেতে পারে।[৫] ঢাকা ওয়াসার বরাত দিয়ে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ঢাকা নগরীতে ৪৩টি খালের অস্তিত্ব রয়েছে, যার মধ্যে ওয়াসার নিয়ন্ত্রণাধীন ২৬টি খাল পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। অবশিষ্ট ১৭টি খাল সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বহীন। ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং কর্তৃক ঢাকা মহানগরীতে ৫০টি ড্রেনেজ খাল চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে আটটি খালকে বক্সকালভার্ট-এ রূপান্তর করা হয়েছে। খালসমূহ দখল ও ভরাট করে বক্সকালভার্ট এবং কালভার্ট-এর মাধ্যমে রাস্তা, সরু রাস্তা, ভবন, দোকানপাট এবং আবাসন নির্মাণ করা হচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত কালভার্ট, বক্স কালভার্ট এবং দখলকারদের কবলে পড়ে এ খালসমূহ কোথাও নর্দমা আবার কোথাও নালার আকার ধারণ করেছে।

ঢাকাবাসীর স্বাভাবিক ও পরিবেশসম্মত জীবনযাপনে একসময় এ খালসমূহ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে আসছিল। ঢাকা মহানগরীর পানি নিষ্কাশনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে এ খালসমূহের অবদানও ছিল অনস্বীকার্য। বর্তমানে সামান্য বৃষ্টিতে নজিরবিহীন জলাবদ্ধতা খালসমূহ ভরাটেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব। ঢাকার খালসমূহ ভরাটের কারণে সামান্য ভারী বৃষ্টিতে ঢাকার নিচু এলাকাগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে, অচল হয়ে পড়ছে জনজীবন এবং রাস্তায় রাস্তায় তৈরি হচ্ছে মানুষের মৃত্যুফাঁদ। ২০০৪ সালে এক দিনের বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার কারণে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল তৎকালীন সরকার। বর্তমান সময়ে জলাবদ্ধতা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ভয়াবহ এ জলাবদ্ধতা থেকে ঢাকাবাসীকে মুক্তি দেয়া সম্ভব খালগুলো পুনরুদ্ধার ও সংস্কারের মাধ্যমে। এ চেতনাকে সামনে রেখে বিভিন্ন গবেষণা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং কর্তৃক চিহ্নিত ৫০টি খাল পুনরুদ্ধারে বেলা ২০১৭ সালে জনস্বার্থমূলক মামলা (নং ১৬৮৯৮/২০১৭) দায়ের করে। মামলার প্রাথমিক শুনানি শেষে আদালত গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ঢাকা শহরের খালগুলোকে জোরপূর্বক দখল, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং দূষণ হতে রক্ষায় বিবাদীগণের ব্যর্থতা কেন বেআইনি ও জনস্বার্থবিরোধী ঘোষণা করা হবে না এবং খালগুলোকে অবৈধ দখল ও অবকাঠামো অপসারণ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কেন বিবাদীগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন। একইসঙ্গে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র; পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক; বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক; রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং ঢাকার জেলা প্রশাসককে খালগুলোর বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং উক্ত খালসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য মূল প্রবাহ অনুযায়ী খালগুলোর সীমানা

নির্ধারণ, অবৈধ দখলদার ও দূষণকারীদের তালিকা প্রস্তুত ও খালসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণসংক্রান্ত সময় নির্ধারণপূর্বক কর্মপরিকল্পনা আগামী ১ জুলাই ২০১৮ তারিখের মধ্যে বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, যে খালগুলোর মূল প্রবাহ অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণ, দখল ও দূষণকারীদের তালিকা প্রস্তুত, তাদের কবল থেকে রক্ষা ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেলা মামলাটি দায়ের করে; তা হলো– রামচন্দ্রপুর খাল, কাঁটাসুর খাল, ইব্রাহীমপুর প্রধান খাল, কালশী খাল, বাউনিয়া খাল, আব্দুল্লাহপুর খাল, দিয়াবাড়ী খাল, দ্বিগুণবাড়ী খাল, গুলশান-বনানী খাল, মহাখালী খাল, ধানমন্ডি খাল, পরীবাগ খাল, রাজাবাজার খাল, বাইশটেকি খাল, হাজারীবাগ খাল, কামরাঙ্গীরচর খাল, বেগুনবাড়ী খাল, নরাইল খাল, সেগুনবাগিচা-আরামবাগ খাল, সেগুনবাগিচা খাল, গোপীবাগ খাল, ধোলাই খাল অংশ-১, শাহজাহানপুর খাল, খিলগাঁও-বাসাবো খাল, জিরানী খাল, মান্ডা খাল, দক্ষিণগাঁও-নন্দীপাড়া খাল, মেরাদিয়া-গজারিয়া খাল, নাসিরাবাদ-নন্দীপাড়া খাল, নন্দীপাড়া-ত্রিমোহিনী খাল, সূতিভোলা খাল, শাহজাদপুর খাল, ডুমনি খাল, বোয়ালিয়া-বাউফার খাল, গোবিন্দপুর খাল, সাংবাদিক কলোনি খাল, মিরপুর হাউজিং খাল (সেকশন-১৪), দ্বিগুল খাল রূপনগর, কাশিবাড়ী-উত্তরা রেলওয়ে বড়পিট খাল, কাশিবাড়ী-বোয়ালিয়া খাল, খিলক্ষেত বোয়ালিয়া খাল, কুড়িল-বোয়ালিয়া খাল, কল্যাণপুর প্রধান খাল, কল্যাণপুর 'ক', 'খ' 'ঘ' 'ঙ' 'চ' খাল। জনস্বার্থমূলক এ মামলায় সংবিধানের ১৮ক, ৩১, ৩২ ও ৪২ অনুচ্ছেদ; বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭; বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০; বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩; নগর উন্নয়ন আইন, ১৯৫৩; ঢাকা মাস্টার প্ল্যান; জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩; মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ আইনসমূহের লঙ্ঘন হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ উল্লিখিত ৫০টি খাল আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হলে ঢাকাবাসী ফিরে পাবে স্বাভাবিক ও পরিবেশসম্মত জীবন। উদ্ধার হোক প্রাণসঞ্চারী খালসমূহ, বাস্তবায়িত হোক সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ– এটাই বর্তমান সময়ের প্রধান দাবি। ■


তথ্যসূত্র

১. WATER SUPPLY OF DHAKA CITY: MURKY FUTURE, Unnayan Onneshan, 2011
২. *আমার দেশ*, ২২ মার্চ, ২০১৭
৩. জাগরণীয়া, অনলাইন ডেস্ক, ৫ মে, ২০১৭
৪. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৮ মে, ২০১৬
৫. WATER SUPPLY OF DHAKA CITY: MURKY FUTURE, Unnayan Onneshan, 2011

# সিরীয় শিশুদের আহ্বান

**মিজান মল্লিক**

মা তখন রুটি তৈরি করছিলেন। আর তার ছোট্ট শিশুটি ঘরে খেলছিল। তখনই বিমান হামলা। ছাদ ধসে পড়ে। শিশুটি গুরুতর আহত হয়। মা তাকে নিয়ে যান হাসপাতালে। আর কয়েক মুহূর্ত পরে যুদ্ধবাজ পক্ষগুলোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মরে যাবে তার জাদু সোনা। মা ডুকরে কাঁদছেন। আর বলছেন, 'মরে যা বাছা। এই যন্ত্রণা থেকে তুই বেঁচে যা। এরপর সোজা চলে যাবি বেহেশতে। সেখানে অন্তত খাবার পাবি।' এক নারী চিকিৎসক তখন উন্মাদিনী প্রায় এই জননীকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছিলেন। একবার মরণোন্মুখ শিশুটির দিকে, আরেকবার এই বিলাপরতা নারীটির দিকে চেয়ে তিনিও ভেঙে পড়েন। দুই হাতে মুখ ঢেকে মেঝের ওপর বসে পড়েন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন পেশাদার চিকিৎসক এই নারীও।

পূর্ব সিরিয়ার ঘৌতা শহরের হাসপাতালটিতে তখন আরো কয়েকটি শিশুকে আনা হয়। পুতুলের মতো দেখতে ফুটফুটে একটি মেয়ে। হাসপাতালের শয্যায় বসা। চিকিৎসকেরা আলতো হাতে

ওর বুকে-পিঠে থাপ্পড় দিচ্ছেন। শিশুর দৃষ্টি এমন ঘোলাটে যে, প্রাণবায়ু তার আছে নাকি বেরিয়ে গেছে, বোঝা যায় না।

সরকারি বাহিনীর বিমান হামলা। জীবন বাজি রেখে পড়িমরি করে ছুটছে মানুষ। এক গৃহবধূ গাড়িতে করে পালাচ্ছেন। তার কোলের শিশুটির মুখ থেকে ঝরছে টকটকে লাল রক্ত। আরো কিছুক্ষণ পর একটি ভ্যানে করে আনা হয় কাপড়ে মোড়ানো একদল শিশুর লাশ। স্বজনেরা একেকটা নিথর শরীর শেষবারের মতো বুকে জড়িয়ে ধরছেন। আর্তনাদ করছেন। বিবিসির ভিডিওচিত্রে এসব দৃশ্য দেখা যায়। মরার আগে বড়দের কাছে কী আহ্বান রেখে গেছে এই শিশুরা? আর যুদ্ধ নয়!

রাজধানী দামেস্কের অদূরে অবস্থিত এই পূর্ব ঘৌতা এলাকা। সেখানে প্রায় ৪ লাখ বাসিন্দার বাস। এলাকাটি কয়েক বছর ধরে বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ কারণে ২০১৩ সাল থেকে সরকারি বাহিনী অবরোধ করে রাখে। বাসিন্দারা আটকা পড়ে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সরকারি বাহিনী পূর্ব ঘৌতায় বড় ধরনের অভিযান শুরু করে। তা অব্যাহত আছে। বিমান ও হেলিকপ্টার থেকে নির্বিচারে হামলা চালানো হচ্ছে। শুধু আকাশ থেকেই নয়, নিচে লড়াই করছে পদাতিক বাহিনী। লোকজন নিরাপদে পালাতেও পারছে না। যদিও বেসামরিক নাগরিকদের সরে আসার সুযোগ করে দিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এক মাসের অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে। সিরিয়ান সরকারের মিত্র রাশিয়া প্রতিদিন সেখানে পাঁচ ঘণ্টার 'মানবিক যুদ্ধবিরতি'র ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের বাহিনী তা মানছে না। নির্বিচার হামলা চলছেই। এ সময়ের মধ্যে সেখানে অন্তত ৬৫০ বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। আর এদের বেশিরভাগই শিশু।

> এ যুদ্ধ শুধু আসাদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরবসহ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তি জড়িয়ে পড়েছে। তাদের সামরিক শক্তি, অর্থায়ন ও রাজনৈতিক সমর্থন দুই পক্ষকেই শক্তিশালী করেছে। পরিণত হয়েছে এক প্রক্সি রণক্ষেত্রে।

পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তা তুলে ধরতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিওচিত্র আপলোড করেছে মুহাম্মদ নাজিম নামের এক কিশোর। তার বয়স ১৫। বিমান হামলায় গুঁড়িয়ে যাওয়া একটি ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'এখানে গণহত্যা চালাচ্ছে আসাদের বাহিনী। পরস্থিতি এমন ভয়াবহ যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। পুতিন-আসাদ-খামেনি আমাদের শৈশব হত্যা করছে। আমরা এভাবে মরতে চাই না। আমরা বাঁচতে চাই, চাই শান্তি। হে, বিশ্ববাসী আর চুপ করে থেকো না। তোমাদের এই নীরবতাই আমাদের খুন করছে। দোহাই তোমাদের, আমাদের রক্ষা করো। শিগ্‌গির এগিয়ে এসো, যেন আর খুব বেশি দেরি না হয়ে যায়।' *দ্য গার্ডিয়ান* এই ভিডিওচিত্রটি আপলোড করেছে। এতে আকাশে বিমান চক্কর দিতে দেখা গেছে। একটু দূরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়ছে। বিমান হামলায় বিধ্বস্ত ভবনের দিকে উদ্ধারকর্মীরা ছুটছেন। আতঙ্কিত লোকজন দৌড়ে পালাচ্ছে। শিশুরা বড় বড় চোখ করে দেখছে এসব।

পূর্ব ঘৌতায় এমন মানবিক বিপর্যয় চলছে, কারণ সরকার চায় এলাকাটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। এটি বিদ্রোহীদের শেষ শক্ত ঘাঁটির একটি। আয়তন যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারের সমান। এলাকাটি মূলত কৃষিখামারের জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করছে সরকারি বাহিনী। পূর্বাঞ্চল বেইত সওয়ায় সেনা ও ইসলামপন্থি সংগঠন জইশ আল-ইসলামের যোদ্ধারা মুখোমুখি লড়াই করছে। সেখানে আল-কায়েদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হায়াত তাহরির আল-শাম নামের আরেকটি গোষ্ঠীর যোদ্ধারাও আছে।

সরকার চাইছে, অন্তত ঘৌতা অঞ্চলকে দুই ভাগে বিভক্ত করতে। এ লক্ষ্যে সেনারা কয়েকটি ফ্রন্টে অগ্রসর হয়েছে। পূর্ব দিক কয়েকটি গ্রাম ও কৃষিখামার কবজা করেছে। এ হলো সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের দাবি। এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নিতে গিয়ে সরকারি বাহিনী বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিষয়টি জরুরিই। গত বছরে অনেক রক্ত ঝরেছে সিরিয়ায়। অথচ শুরুটা ছিল শান্তিপূর্ণ। সাত বছর আগের এই মার্চেরই এক দিন। দেশটিতে শুরু হয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদবিরোধী বিক্ষোভ। মুহুর্মুহু স্লোগান ওঠে। এ বিক্ষোভের প্রকৃতি ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু আরেক দিন মিছিল চলাকালে হঠাৎ গুলির শব্দ। এক বিক্ষোভকারীর বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয়। তিনি লুটিয়ে পড়েন রাজপথে। বিক্ষোভ হয়ে ওঠে সহিংস। ধীরে ধীরে তা রূপ নেয় গৃহযুদ্ধে। ইতিমধ্যে নারী ও শিশুসহ ৩ লাখ ৪০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। সুদৃশ্য বাড়িগুলো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সেখানে এখন লড়ছে বহু বিদ্রোহী গ্রুপ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শক্তির মহড়া দিচ্ছে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো।

পিতা হাফিজ আল-আসাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে বাশার আল-আসাদ ২০০০ সালে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন। কয়েক বছর যেতে না যেতেই বেকারত্বের হার অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। এর ভয়াবহ শিকার হন সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিরা। তা ছাড়া দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অগণিত সিরীয় টের পান তারা বাক্ ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাবঞ্চিত। নানা বৈষম্যের শিকার। দেখতে দেখতে ২০১১ সাল। আরব বসন্তের প্রভাবে দক্ষিণ সিরিয়ার দেরা শহরে গণতন্ত্রপন্থিরা রাজপথে নামে। তাদের প্রতিহত করতে সরকার মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে। আর এতে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে এ শহর ও শহর হয়ে সারা দেশে। তাদের এক দাবি, 'ক্ষমতা ছেড়ে আসাদ তুই কবে যাবি'। বিক্ষোভ যত সংহত হয়, সরকারের দমনপীড়ন তত বাড়ে। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নেয়। পরে তা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে বিতাড়নে ব্যবহার করে। আসাদ তাদের আখ্যা দেন, 'বিদেশি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী'। দেশের

আইনশৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখতে এদের সমূলে বিনাশের অঙ্গীকার করেন। এ ছিল আগুনে ঘি ছিটিয়ে দেয়ার মতো। দাউ দাউ জ্বলে ওঠে গোটা সিরিয়া। শত শত বিদ্রোহী ব্রিগেড সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে। ছড়িয়ে পড়ে গৃহযুদ্ধ।

এ যুদ্ধ শুধু আসাদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরবসহ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তি জড়িয়ে পড়েছে। তাদের সামরিক শক্তি, অর্থায়ন ও রাজনৈতিক সমর্থন দুই পক্ষকেই শক্তিশালী করেছে। পরিণত হয়েছে এক প্রক্সি রণক্ষেত্রে। সিরিয়া একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু বহিঃশক্তিগুলো ধর্মীয় উন্মাদনা জাগিয়ে তুলতে প্ররোচনা জুগিয়েছে। প্রেসিডেন্ট আসাদের সংখ্যালঘু শিয়া আলাওয়ি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের খেপিয়ে তুলেছে। শিয়া-সুন্নির বিভেদ তীব্র করেছে। এক পক্ষ আরেক পক্ষের ওপর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। প্রাণহানি বেড়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমেছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার আশা। সেখানে জিহাদি গ্রুপগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠায় যুদ্ধে নতুন মাত্রা লাভ করে। আল-কায়েদার মতাদর্শী আল-নুসরা ফ্রন্টের সহযোগী সংগঠন হায়াত তাহরির আল-শাম উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ার বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। উত্তর-পূর্ব সিরিয়ার একটি বড় অংশ ছিল ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর নিয়ন্ত্রণে। তবে রুশ সমর্থিত সরকারি বাহিনী, যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট কুর্দি মিলিশিয়া এবং তুরস্কের সমর্থিত বিদ্রোহী ব্রিগেডগুলোর আক্রমণের মুখে ইতিমধ্যে আইএস অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। এদিকে তাদের ভাষায়, শিয়াদের পবিত্র স্থানগুলোর মর্যাদা রক্ষায় ইরান, লেবানন, ইরাক, আফগানিস্তান ও ইয়েমেনের হাজার হাজার শিয়া মিলিশিয়া সিরিয়ার সেনাবাহিনীর পক্ষে অস্ত্র ধরছে।

প্ল্যাকার্ডে প্রতিবাদ ও বাঁচার আর্তি

বহিঃশক্তিগুলোর জড়িয়ে পড়ার কারণ অনেক। প্রেসিডেন্ট আসাদের মিত্র রাশিয়া ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে সিরিয়ায় 'সন্ত্রাসীদের' ওপর বিমান হামলা শুরু করেছে। মস্কো বরাবরই জোর দিয়ে বলে আসছে, তাদের লক্ষ্য 'সন্ত্রাসীদের' দমন এবং সিরিয়ায় স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। কিন্তু মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ, পশ্চিমা-সমর্থিত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর ওপর হামলা চালিয়ে আসছে রাশিয়া। এ হামলার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না নারী ও শিশুসহ নিরস্ত্র বেসামরিক সিরীয়রা। ২০১৬ সালে বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটি পূর্ব আলেপ্পো শহরে রাশিয়া ভয়াবহ বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। আইএস নিয়ন্ত্রিত দেইর আল-জওর গুঁড়া করে দিয়েছে ২০১৭ সালে। দুই মাস পর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সিরিয়া থেকে রুশ বাহিনীর অংশবিশেষ প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। তবে বিমান হামলা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

তা ছাড়া ইরানের শিয়া সরকার সিরিয়ার আলাওয়ি সরকারকে টিকিয়ে রাখতে প্রতিবছর কোটি কোটি ডলার সহায়তা দিয়ে আসছে। দিচ্ছে সামরিক প্রশিক্ষণ, সরবরাহ করছে অস্ত্র ও তেল। সিরিয়ায় শত শত ইরানি সেনা সরাসরি যুদ্ধ করছে। আরব বিশ্বে ইরান হলো আসাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র। আর ইরান লেবাননের শিয়াপন্থি গোষ্ঠী হিজবুল্লাহকে অস্ত্র সরাবরাহ করে আসছিল সিরিয়ার মধ্য দিয়ে। এ কারণে আসাদের বাহিনীর পক্ষে হিজবুল্লাহ সদস্যরাও লড়াই করছে।

অপর দিকে, হিজবুল্লার ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে ওঠায় ইসরায়েল উদ্বিগ্ন। এজন্য তেলআবিব হিজবুল্লা গেরিলাদের ওপর বিমান হামলা চালাচ্ছে।

সিরিয়ায় চলমান এ গৃহযুদ্ধে প্রাণহানির ঘটনার জন্য প্রেসিডেন্ট আসাদকেই দায়ী করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি আসাদকে উৎখাতে লড়াইরত 'উদারপন্থি' বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে সহায়তা দিচ্ছে। তবে ২০১৪ সাল থেকে সিরিয়ায় আইএস-এর লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালিয়ে আসছে। ২০১৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আসাদের একটি বিমান ঘাঁটিতে হামলার নির্দেশ দেন। ওই ঘাঁটি থেকে বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণাধীন খান শেখউন শহরে রাসায়নিক হামলা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। তা ছাড়া সিরিয়ায় ওয়াশিংটনের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হলো কুর্দি ও আরব মিলিশিয়াদের জোট সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এসডিএফ)। ২০১৫ সাল থেকে এসডিএফের যোদ্ধারা আইএস জঙ্গিদের হটিয়ে অনেক এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দেয়, সিরিয়ার এই গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং ইরানীয় প্রভাব দূর করতে তারা এসডিএফ-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় মার্কিন সেনাদের নিযুক্ত করবে।

বিদ্রোহীদের আরেক বড় মিত্র হলো তুরস্ক। এখানে আঙ্কারার নিজ স্বার্থ রয়েছে। আঙ্কারার অভিযোগ, কার্দিশ পপুলার প্রটেকশন ইউনিটস (ওয়াইপিজি) মিলিশিয়া গোষ্ঠী মূলত কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (পিকেকে) আরেক নাম। তুরস্কে কুর্দিদের জন্য স্বশাসনের

দাবিতে পিকেকে সশস্ত্র সংগ্রাম করছিল। এ কারণে তিন দশক আগে একে নিষিদ্ধ করে আঙ্কারা।

২০১৬ সালের আগস্টে সীমান্ত এলাকা থেকে সিরিয়ায় আইএস জঙ্গিদের বিতাড়িত করতে সেনা পাঠায় তুরস্ক। সেনারা একটি বিদ্রোহী গ্রুপের পক্ষে লড়াই করে। জারাব্লুস আল-বাব এলাকায় এ লড়াই হয়। এ অংশটি কুর্দি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। গত জানুয়ারিতে উত্তর-পশ্চিম সিরিয়ায় কুর্দি ছিটমহল আফ্রিন থেকে ওয়াইপিজে বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করতে সেনা অভিযান চালায় তুরস্ক। সুন্নিশাসিত সৌদি আরব শিয়া ইরানীয় ক্ষমতা খর্ব করতে সিরিয়ায় লড়াইরত বিদ্রোহীদের অর্থ ও সামরিক সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

এ যুদ্ধের পরিণতি অনেক ভয়াবহ। জাতিসংঘ বলছে, সিরিয়ায় ২০১৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত অন্তত আড়াই লাখ মানুষ নিহত হয়েছে। এর পর আরো কত মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে তার হিসাব হালনাগাদ করেনি সংস্থাটি। যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'দ্য সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস' বলছে, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৬০০-এর অধিক মানুষ নিহত হয়েছে। এর মধ্যে বেসামরিক সিরীয় অন্তত ১ লাখ ৩০ হাজার। সংগঠনটি আরো বলেছে, সিরিয়ায় ৫৬ হাজার ৯০০-এর অধিক মানুষ নিখোঁজ। তাদের এই পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে, একটি থিংক-ট্যাংক ২০১৬ সালেই দাবি করে, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে তখনই নিহত মানুষদের সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ৭০ হাজারের বেশি।

এ সময়ের মধ্যে প্রায় ৫৬ লাখ সিরীয় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। তাদের সিংহভাগই নারী ও শিশু। এরা প্রতিবেশী দেশ লেবানন, জর্ডান ও তুরস্কে আশ্রয় নিয়েছে। দেশত্যাগের পর ১০ শতাংশ সিরীয় ইউরোপে আশ্রয় নিতে সক্ষম হয়েছে। সিরিয়ায় আরো অন্তত ৬১ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে দেশের ভেতরেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জাতিসংঘ বলছে, চলতি বছর সিরিয়ার ভেতরে আটকে পড়া অন্তত ১ কোটি ৩১ লাখ মানুষের জন্য ৩০৫ কোটি ডলার ত্রাণ সহায়তা দরকার। সিরিয়ায় ৭০ শতাংশ মানুষ চরম দরিদ্র হয়ে পড়েছে। ৬০ লাখ মানুষ সুপেয় পানি ও খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

যুদ্ধের অবসান ঘটাতে তৎপরতা চলছে বটে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অনেক আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, সিরিয়ায় চলমান গৃহযুদ্ধে কোনো পক্ষের জয় লাভ করা মোটেও সহজ হবে না। এ সংকটের একমাত্র সুরাহা হতে পারে রাজনৈতিকভাবে। জাতিসংঘ সব পক্ষকে ২০১২ জেনেভা কনভেনশন বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে আসছে। যেখানে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে একটি মতৈক্যের সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের মনোনীত শান্তি আলোচনা ২০১৪ সালে শুরু হয়। সর্বশেষ বৈঠক হয় ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে। সেখানে সিরিয়ার সংবিধান সংস্কার এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে এতে অগ্রগতি খুব একটা হয়নি। ■

*সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান ও বিবিসি*

# ক্যাম্প কি রোহিঙ্গাদের শেষ আশ্রয়স্থল?

**সুবর্না ধর**

আগস্ট ২০১৭ থেকে শুরু হওয়া মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর ওপর জাতিগত নিধন ও গণহত্যার বিষয়টিকে দেশটির সরকার বরাবর অস্বীকার করে আসছে। অন্যদিকে, জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বর্ণনায় উঠে আসে হত্যা, ধ্বংস, অমানবিক নির্যাতনের চিত্র। এ বছরের জানুয়ারিতে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সিউলে একটি সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের নিযুক্ত মিয়ানমারের মানবাধিকারবিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার ইয়াংহি লি বলেন, "রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর দেশটির সেনাবাহিনীর অভিযানে 'গণহত্যার বৈশিষ্ট্য' পাওয়া যায়।" তিনি আরো বলেন, এসব আলামত ধীরে ধীরে আরো জোরালো হচ্ছে।

২ সেপ্টেম্বর মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের ওহহ উরহ গ্রামে ১০ রোহিঙ্গাকে হত্যা করে এক কবরে কবর দেয়া হয় বলে উল্লেখ করা হয় রয়টার্সের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে। 'Massacre in Myanmar' শিরোনামের এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, '১০ রোহিঙ্গার মধ্যে অন্তত দুজনকে কুপিয়ে হত্যা করে তাদের প্রতিবেশীরা। আর সেনাসদস্যরা নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প

অন্য আটজনকে।' ডিসেম্বরে প্রকাশিত হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'-এর একটি প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয় রাখাইন রাজ্যের তুলাতলি গ্রামে রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো পাশবিক অত্যাচারের কথা। 'Massacre by the River Burmese Army Crimes against Humanity in Tula Toli' শিরোনামের এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়– গত ২৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী হত্যা, ধর্ষণ, বর্বর হামলায় মেতে ওঠে। ডিসেম্বরে Médecins Sans Frontières (ডক্টরস উইদআউট বর্ডারস) বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে একটি 'মৃত্যুহার নির্ণয় জরিপ' পরিচালনা করে, যাতে দেখা যায়– আগস্ট ২৫ পরবর্তী সহিংসতায় কমপক্ষে ৬ হাজার ৭০০ রোহিঙ্গা মারা গেছে।

ফেব্রুয়ারিতে রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আসা নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া তিনজন নারী উইয়ার রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন শেষে সংবাদ সম্মেলনে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। তারা এটিকে একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ও একবিংশ শতাব্দীর গণহত্যা বলে উল্লেখ করেন। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী যুক্তরাজ্যের মেইরিড ম্যাকগুয়ের তার বক্তব্যে বলেন, এই গণহত্যাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই গণহত্যার বিচারের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

কিন্তু মিয়ানমার কতটা পাত্তা দিচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে? সম্প্রতি, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, গত আগস্ট ২০১৭ থেকে এই পর্যন্ত কমপক্ষে ৫৫টি গ্রামে রোহিঙ্গাদের বাড়ি-ঘরসহ নানা স্থাপনা ধ্বংস করে ফেলে মিয়ানমার সরকার। এই ধ্বংসযজ্ঞকে রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর ওপর সহিংসতা তথা গণহত্যার প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলার চেষ্টা বলে মন্তব্য করা হয় প্রতিবেদনে। অন্যদিকে, শুরু থেকেই মানবাধিকার ও গণমাধ্যমকর্মীদের রাখাইন রাজ্য পরিদর্শনে একরকম নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এমনকি উত্তর রাখাইন রাজ্যে সরকারের বিধিনিষেধের কারণে সব ধরনের মানবিক সহযোগিতা বন্ধ করতে বাধ্য হয় জাতিসংঘের সাহায্য সংস্থাসমূহ। ২০১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর মিয়ানমার পুলিশ 'massacre in Myanam' প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করার সময় গ্রেফতার করে রয়টার্সের দুই সাংবাদিক ওয়া লোন ও কিউ সোয়ে ওকে। এরা দুজনই মিয়ানমারের নাগরিক। তাদের বিরুদ্ধে রাখাইনসংক্রান্ত গোপন দলিল সংগ্রহের অভিযোগ আনা হয়। সম্প্রতি, জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের নিযুক্ত মিয়ানমারের মানবাধিকারবিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার ইয়াংহি লি'কে মিয়ানমারে প্রবেশের অনুমতিই দেয়নি দেশটির সরকার।

এর মধ্যে, গত নভেম্বরে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। সমঝোতা স্মারক এবং এই নিয়ে সম্ভাবনা ও সংশয়ের কথা আসক-এর *বুলেটিন* ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা থাকলেও যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলে তা পিছিয়ে দেয়া হয়। ফেব্রুয়ারিতে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে মিয়ানমারকে ১ হাজার ৬৭৩টি পরিবারের ৮ হাজার ৩২ জনের তালিকা দেয় বাংলাদেশ। এই তালিকা যাচাই-বাছাই করে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে গণমাধ্যমকে জানানো হয়। মিয়ানমারও রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাদের ইতিবাচক মনোভাব দেখায়। কিন্তু সেই সঙ্গে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে অবস্থানের প্রমাণ যাচাইয়ের বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দেয়। এসব শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অবস্থান করা শরণার্থীদের ঠিক কত অংশ মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হবে, তা নিয়ে প্রথম থেকেই সংশয় দেখা দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে মিয়ানমারের ফিরে যাওয়ার পর তাদের নাগরিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকার কতটা সুরক্ষিত থাকবে, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করে বাংলাদেশে অবস্থান নেয়া শরণার্থীরা এবং মানবাধিকার সংস্থাসমূহ।

অন্যদিকে, মিয়ানমারের সাম্প্রতিক সময়ের কার্যক্রম সেই সংশয়কে আরো নিশ্চিত করছে বলে ধারণা করা হয়। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির তমব্রু সীমান্তের ওপারে দেড় শ গজের মধ্যে ভারী অস্ত্রসহ অতিরিক্ত সেনাসমাবেশ ঘটাতে শুরু করে মিয়ানমার। গত আগস্টে হামলার পর ৬ হাজারের অধিক রোহিঙ্গা তমব্রু সীমান্তবর্তী নো-ম্যানস ল্যান্ডে নির্মিত অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নেয়। ১ মার্চ থেকে নো-ম্যানস ল্যান্ডের কাঁটাতারের বেড়া ঘিরে টহল জোরদার করেছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী। তারা লাউড স্পিকার ব্যবহার করে

রোহিঙ্গাদের ওই এলাকা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে বলে গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়। এমনকি নো-ম্যানস ল্যান্ডে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের বিতাড়িত করার লক্ষ্যে ফাঁকা গুলি ছোড়ার কথা সেখানে অবস্থানরত রোহিঙ্গারা গণমাধ্যমকে জানান।

সীমান্তবর্তী এলাকায় এই ধরনের তৎপরতা শরণার্থীদের যেমন নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা না করার বার্তা দিচ্ছে, ঠিক তেমনি সংকটাপন্ন করে তুলছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তথা আইনের তোয়াক্কা না করে একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার সব ধরনের অপকৌশল বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে মিয়ানমার সরকার। এর বিপরীতে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কিছু বিবৃতি, সীমিত কিছু অবরোধ আরোপ ছাড়া আর কোনো ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে প্রতীয়মান হয় না। একটি সুপরিকল্পিত গণহত্যা বন্ধে এবং এর জন্য দায়ীদের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে একরকম নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। আর এই নিস্তব্ধতার ভিড়ে একটি জাতি হয়ে পড়ছে দেশহীন, পরিচয়হীন, ক্যাম্প হয়ে উঠছে তাদের শেষ আশ্রয়স্থল। এমনকি, সেসব ক্যাম্পেও মৃত্যু তাদের পিছু ছাড়ছে না।

সম্প্রতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচআরসি) পরিচালিত একটি সমীক্ষায় ধারণা করা হয়, আগামী বর্ষায় আগস্ট ২০১৭-পরবর্তী বাংলাদেশের অবস্থান নেয়া ৭ লাখ রোহিঙ্গার মধ্যে ৮৫ হাজারের অধিক আশ্রয়হীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এবং প্রায় ২৩ হাজার, যারা পাহাড়ের ঢালে বসতি স্থাপন করেছে তারা ভূমিধসের শিকার হবে বলে আশঙ্কা করা হয়। ■

**তথ্যসূত্র**

১. http://time.com/5098233/myanmar-military-soldiers-rohingya-mass-grave/
২. https://www.theguardian.com/global-development/2018/mar/01/bangladesh-monsoon-rains-further-misery-rohingya-myanmar
৩. https://www.hrw.org/report/2017/12/19/massacre-river/burmese-army-crimes-against-humanity-tula-toli
৪. http://www.banglatribune.com/foreign/news/298853/
http://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1441716/

# সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা

**এ. কে. এম বুলবুল আহমেদ**

সারা দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের ওপর হামলা, উচ্ছেদ ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া হামলা, উচ্ছেদ ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণে কমবেশি একই ধরনের চিত্র পাওয়া যায়। প্রশাসনের দায়িত্বরত ব্যক্তিরা হামলা ও উচ্ছেদের কোনো কোনো ঘটনায় সরাসরি সম্পৃক্ত হয়েছেন, অন্যদিকে কিছু ঘটনায় তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও গাফিলতির সুযোগে হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দীর্ঘসময় পেরিয়ে গেলেও ঘটনার তদন্তে তেমন অগ্রগতি নেই। সাম্প্রতিক কালে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হলো। ঘটনার পর সর্বশেষ অবস্থাও এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানের পর্যবেক্ষণ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রকাশিত তদন্ত প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের তথ্যের আলোকে এই সারসংক্ষেপটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

### ১. রামু, কক্সবাজার

ফেসবুকে কোরআন শরিফ অবমাননা হয়েছে, এই গুজব ছড়িয়ে ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলাসহ কক্সবাজার সদর, টেকনাফ ও ও উখিয়ায় দুষ্কৃতকারীদের একাধিক দল বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের শত বছরের পুরোনো ১২টি বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে এবং বৌদ্ধপল্লির ৪৫টির মতো বসতবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ভাঙচুর করে শতাধিক ঘরবাড়িতে। সবচেয়ে ভয়াবহ হামলাটি হয় রামু সদর ইউনিয়নে। এতে আশপাশের কয়েকটি ইউনিয়ন থেকে ট্রাকে করে কয়েক হাজার মানুষ প্রথমে রাত সাড়ে ১১টার দিকে এক জায়গায় সমবেত হয়। রাত ১২টার পর সংঘবদ্ধ লোকজন

বৌদ্ধমন্দিরগুলোতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে। এ ঘটনায় উসকানিদাতা ও হামলায় নেতৃত্বদানকারী হিসেবে একইসঙ্গে স্থানীয় জামায়াত, বিএনপি ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ভূমিকার তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্যানুসন্ধান পর্যবেক্ষণে আরো প্রতীয়মান হয়, গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সন্ধ্যা থেকেই যখন সাম্প্রদায়িক উসকানিদাতারা সভা ও মিছিল করছিল তখন স্থানীয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সহিংসতা ভয়াবহ আকার ধারণ করে, তখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং জনপ্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কিংবা ঘটনার ব্যাপকতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণেও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ওই ঘটনায় দায়ের করা ১৯টি মামলার একটি

ভগ্নস্তূপ সংখ্যালঘুর আবাস, উপাসনালয়

প্রত্যাহার করা হয়। চারটি মামলায় প্রকৃত সাক্ষী না পাওয়ায় পুনরায় তদন্ত করছে পিবিআই। প্রাথমিকভাবে ১৫ হাজার লোকের নাম থাকলেও, পরে ১৯টি মামলায় ৩৮৪ জনের নামে অভিযোগপত্র দেয়া হয়। এরপর কোনো মামলায় তদন্ত সঠিক হয়নি বলে অধিকতর তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আসামিরা জামিনে মুক্তি পেয়ে মামলার বাদীদের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার বিষয়ে সন্দিহান ভুক্তভোগীরা।

### ২. সাঁথিয়া, পাবনা

রামু ঘটনার এক বছর পর ২০১৩ সালের ২ নভেম্বর ফেসবুকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগ এনে পাবনার সাঁথিয়ার বনগ্রামে হিন্দুপল্লিতে হামলা চালানো হয়। ঘটনার দিন এলাকায় ত্রিমুখী হামলা হয়। একদল বাজারে মিছিল বের করে, একদল পাবনা-নগরবাড়ী সড়কে কাঠের গুঁড়ি ফেলে রাস্তা বন্ধ করে দেয়, অন্য দলটি লাঠিসোঁটা, ধারালো অস্ত্র নিয়ে হিন্দুবাড়ি ও মন্দিরগুলোতে হামলা চালায়। এ ঘটনায় জামায়াত-বিএনপির কর্মীদের পাশাপাশি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুর অনুসারী আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে। ঘটনার পর উসকানিদাতাদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন বলেও তথ্য রয়েছে। অভিযোগ যার বিরুদ্ধে, সে স্থানীয় একটি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র, বনগ্রাম বাজারের দোকানমালিক বাবলু সাহার একমাত্র ছেলে। হাইকোর্ট বিভাগ বাবলু সাহাকে ৪৩ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য সরকারকে আদেশ দেন, যদিও ওই টাকা সে এখনো পায়নি। এ ঘটনায় তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় ওই কিশোরের বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ। অভিযোগের সত্যতা না থাকায় পরে ওই কিশোর মামলা থেকে অব্যাহতি পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কে এ ধরনের পোস্ট ফেসবুকে দিয়েছে তা শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। এ ঘটনায় করা তিনটি মামলার একটির দায়িত্ব সিআইডিকে দেয়া হয়। বাকি দুই মামলায় চার্জশিট দেয়া হয়েছে। তবে, ওই ঘটনায় আটক এবং গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের সবাই জামিনে রয়েছেন।

### ৩. নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২০১৬ সালের ২৯ অক্টোবর নাসিরনগর উপজেলার হরিণবেড় গ্রামের রসরাজ দাস নামে জেলে-পরিবারের এক নিরক্ষর যুবক ফেসবুকে পবিত্র কাবাঘর অবমাননা করেছেন অভিযোগে তাকে পিটিয়ে পুলিশে দেয় এক দল যুবক। এলাকায় মাইকিং করে নাসিরনগর উপজেলা সদরে পরদিন ৩০ অক্টোবর প্রতিবাদ-সমাবেশ আহ্বান করা হয়। ৩০ অক্টোবর সকাল ১০টার দিকে নাসিরনগর উপজেলা সদরে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' এবং 'তৌহিদী জনতা'র ব্যানারে পৃথক দুটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওই সমাবেশে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও অংশ নিয়েছিলেন। ১৩ কিলোমিটার দূরের হরিপুর ইউনিয়ন থেকে ১৪ থেকে ১৫টি ট্রাক ভরে মানুষ আসার পর হামলা হয় নাসিরনগরের হিন্দুপল্লিতে। যেসব ট্রাক ও ট্রাক্টরে চড়ে হামলাকারীরা এসেছিল সেগুলোর ব্যবস্থা ও অর্থের জোগান আওয়ামী লীগ দলীয় স্থানীয় চেয়ারম্যান দেওয়ান আতিকুর রহমান আঁখি দিয়েছিলেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এরপর সমাবেশস্থল থেকে আটটি হিন্দুপাড়ায় অন্তত ৩০০টি বসতঘর ও ১০টি মন্দিরে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। এরপর এ ঘটনায় আটটি মামলা হয় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও পুলিশের পক্ষ থেকে। এখন পর্যন্ত গত ১০ ডিসেম্বর একটি মামলার অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করতে পেরেছে পুলিশ। ফরেনসিক রিপোর্ট অনুযায়ী রসরাজ দাসের মোবাইল ফোন থেকে কাবাঘর অবমাননার ছবি আপলোডের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফরেনসিক রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার পর চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি বিচারক রসরাজকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন। কিন্তু বছর পার হলেও সে মামলার কোনো প্রতিবেদন দাখিল না করায় অভিযুক্ত হিসেবেই রয়ে গেছেন রসরাজ দাস।

### ৪. ঠাকুরপাড়া, রংপুর

ফেসবুকে মহানবী (স.)-কে অবমাননা করা হয়েছে, এমন পোস্ট শেয়ারের অভিযোগ তুলে ১০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ রংপুরের গঙ্গাচড়া ও সদর উপজেলায় সীমানায় অবস্থিত ঠাকুরপাড়ায় হামলা চালিয়ে ১৫টি বাড়িঘরে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ঘটনা

নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি চালালে চা-দোকানদার আলমগীর হোসেন (২৮) ঘটনাস্থলে নিহত হন। গত ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে স্থানীয় মুদি ব্যবসায়ী রাজু মিঞা বাদী হয়ে আইসিটি অ্যাক্টের অধীনে টিটু রায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে গঙ্গাচড়া থানায় মামলা দায়ের করেন। এরপর পার্শ্ববর্তী হরিয়ালকুঠি, মোমিনপুর, শলেয়াশাহ ইউনিয়নে তিন দিন ধরে প্রতিবাদসভা, সমাবেশ ও মাইকিং করে লোক জড়ো করা হয়। এরপর সেখান থেকে কয়েক হাজার মানুষ রংপুর-সৈয়দপুর মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী ঠাকুরপাড়ার দিকে অগ্রসর হয়, পুলিশ বাধা দিলে তারা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে যাবার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা চালায়, লুটপাট করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় কয়েকজন তাদের বাধা দিতে এলে তারা নির্যাতনের শিকার হয়। এ ঘটনায় ফজলার রহমান নামে রংপুর জেলা পরিষদের কর্মরত একজন প্রকৌশলীর প্রত্যক্ষ মদদের তথ্য পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় গঙ্গাচড়া ও কোতোয়ালি থানায় দুটি মামলা হয়। মামলা দুটি তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয় ডিবির ওপর। এ ছাড়া কথিত পোস্ট শেয়ারকারী হিসেবে টিটু রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার পরপরই রংপুর জেলা পরিষদের প্রকৌশলী আত্মগোপন করেন। এরপর ২১ ডিসেম্বর ঢাকার শ্যামলী থেকে ডিবির একটি দল ফজলারকে গ্রেপ্তার করে রংপুরে নিয়ে আসে এবং ২৪ ডিসেম্বর তাকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

### ৫. লংগদু, রাঙ্গামাটি

গত ১ জুন (২০১৭) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়নের লাশ খাগড়াছড়ি সদরের চারমাইল এলাকায় রাস্তার পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়। পরের দিন তার লাশ নিয়ে বের হওয়া মিছিল থেকে লংগদু উপজেলা সদরের তিনটিলাপাড়া, মানিকজুড়ছড়া ও বাত্যাপাড়া গ্রামে দুই শতাধিক বাড়ি ও ২২টি দোকানে আগুন দেয়া হয়। চালানো হয় লুটপাট। ওই এলাকা থেকে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় কয়েক হাজার পাহাড়ি আদিবাসী নারী-পুরুষ। এ সময় লংগদু ইউপি চেয়ারম্যানের ঘরের ভেতরে আগুনে পুড়ে মারা যান গুণমালা নামের এক বৃদ্ধা। ঘটনার পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য বাঞ্ছিতা চাকমার নেতৃত্বে কমিশনের একটি তদন্ত দল সরেজমিনে তদন্ত সম্পন্ন করে। মানবাধিকার কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, '...পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা স্পর্শকাতর মনে হওয়ায় এখানে সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাকে সর্বদা তৎপর থাকতে দেখা যায় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে তা জরুরি, তবে এত নজরদারি সত্ত্বেও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রশাসনকে এই তথ্য দিতে কেন ব্যর্থ হলো তা সন্দেহজনক এবং এতে করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ব্যর্থতার চিত্র ফুটে ওঠে।' এ ছাড়া প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, 'উল্লিখিত সকল পরিস্থিতি পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান হয় যে ঘটনার দায়ভার সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসন কিছুতেই এড়াতে পারে না।' ভয়াবহ এ ঘটনার ছয় মাস কেটে গেলেও এর সঙ্গে কারা জড়িত তা চিহ্নিত করতে পারেনি তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ।

অগ্নিসংযোগের ঘটনা তদন্তে আইন অনুযায়ী কমিশন গঠনের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না– তা জানতে চেয়ে ২০১৭ সালের ২১ আগস্ট রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট বিভাগ। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতির নিরূপণ কমিশন কেন করবে না, রুলে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

### ৬. নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি

২০১৪ সালে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের সকালে রাঙ্গামাটির নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের বগাছড়ি-চৌদ্দমাইল এলাকায় তিনটি পাহাড়ি গ্রাম সুরিদাশপাড়া, বগাছড়ি ও নবীন তালুকদারপাড়ায় আদিবাসীদের সাতটি দোকান ও ৫৪টি বসতবাড়ি জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে, কুপিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিঃশেষ করা হয়েছে। পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে গোলার ধান-চালসহ সবকিছু। নিজেদের আনারস ও সেগুনবাগান নষ্টের অজুহাতে বাঙালি সেটেলাররা এ সহিংস হামলা করে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন জানান, সেটেলার বাঙালিরা উত্তেজিত হয়ে দলবদ্ধভাবে পাহাড়িদের ওই তিন গ্রামে অতর্কিত হামলা করে। এ সময় তারা বাড়িঘরে আগুন দেয়। বাঙালিদের আক্রমণের মুখে তাৎক্ষণিক বাড়িঘর ছেড়ে পাশের জঙ্গলে পালিয়ে যায় তারা। করুণা বন বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ওবাসা ভিক্ষু জানান, হামলার সময় তাকে মারধর ও মন্দিরের ভেতরে বুদ্ধমূর্তি ভাঙচুর করা হয়। পাঁচটি পিতলের বুদ্ধমূর্তি লুট হয়েছে। হামলার ঘটনায় চারটি মামলাসহ মোট ছয়টি মামলা হয়েছে। সরকারিভাবে ৬১টি পরিবারের জন্য একটি করে ঘর নির্মাণ করে দেয়ার কথা থাকলেও প্রাথমিকভাবে কিছু ঘর নির্মাণ করার পর বরাদ্দ না থাকার কথা উল্লেখ করে বাকি ঘর নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায়।

### ৭. মালোপাড়া, অভয়নগর, যশোর

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ভোট গ্রহণ শেষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এলাকা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে জামায়াত-বিএনপির ক্যাডাররা আশপাশের গ্রাম রূপদিয়া, বসুন্দিয়া, বালিয়াডাঙ্গা, জিয়াডাঙ্গা, মাগুরা, শিবানন্দপুর, বাহিরঘাট এলাকা থেকে ১৫টির মতো নছিমন ভরে স্থলপথে এবং দুটি ট্রলারে করে নদীপথে এসে হামলা চালায় যশোরের অভয়নগর উপজেলায় মালোপাড়ায়। এই আক্রমণে মালোপাড়ার বেশ কিছু বাড়িঘর ধ্বংস হয়। ভেঙে দেয়া হয় মন্দির ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। এ ঘটনায় আহত হন আরো ১০ জন। অনেকেই শীতের সন্ধ্যায়ই ভৈরব নদীতে ঝাঁপিয়ে ওপারের দেয়াপাড়া গ্রামে আশ্রয় নেন। জামায়াত-শিবির ও বিএনপি প্রকাশ্যে হামলায় অংশ নিলেও ক্ষমতাসীন দলের অন্তঃকোন্দলের কারণে স্থানীয় এমপি পদপ্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা এতে মদদ দেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় ৬ জানুয়ারি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মহসীন হাওলাদার বাদী হয়ে ৩৯ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরো ২০০ থেকে ২৫০ জনকে আসামি করে বিশেষ ক্ষমতা আইনে অভয়নগর থানায় মামলা করেছিলেন। এর এক বছর পর দায়েরকৃত মামলায় ১০০ জনকে অভিযুক্ত করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি)

চার্জশিট দাখিল করে। পুলিশ এসব অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কয়েকজনকে গ্রেফতার করলেও তারা জামিনে বেরিয়ে এসেছেন এবং বাকিরা পলাতক বলে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন।

**৮. গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা**

গত বছরের (২০১৬) ৬ নভেম্বর চিনিকল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসন সাহেবগঞ্জ ফার্মের জমি থেকে সাঁওতালদের উচ্ছেদ করার সময় পুলিশ, চিনিকলের কর্মচারী-কর্মকর্তা ও স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলীয় নেতা ও ইউপি চেয়ারম্যান শাকিল আকন্দ বুলবুলসহ তার অনুসারী নেতা-কর্মী ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাঁওতালসহ ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ এক পর্যায়ে গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন শ্যামল হেমব্রম ও রমেশ টুডু। পরে আখখেতে মঙ্গল মার্ডির মরদেহ পাওয়া যায়। চরণ সরেন, বিমল কিসকু পায়ে এবং দ্বিজেন টুডু চোখে গুলি লেগে হাসপাতালে ভর্তি হন। সাঁওতালদের ছোড়া তিরের আঘাতে ৯ জন পুলিশসহ উভয় পক্ষের প্রায় ৩০ জন এ ঘটনায় আহত হন। উচ্ছেদ অভিযানের একপর্যায়ে পুলিশের কয়েকজন সদস্য ও অন্য কয়েকজন ব্যক্তি সাঁওতালদের ঘরগুলোতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেন। পরের দিন পার্শ্ববর্তী মাদারপুর গ্রামে সাঁওতালদের বাড়িঘরে লুটপাট চালানো হয়। সাঁওতাল ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে ৬ নভেম্বর রাতে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে এসআই কল্যাণ চক্রবর্তী বাদী হয়ে ৪২ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরো ৩০০ থেকে ৪০০ জনের বিরুদ্ধে গোবিন্দগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। চারজন সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে সাঁওতালদের তিনজন নিহত হলেও তৎক্ষণাৎ কোনো মামলা হয়নি। ঘটনার ১১ দিন পেরিয়ে যাবার পর ১৬ নভেম্বর রাতে স্বপন মুর্মু নামের একজন আদিবাসী অজ্ঞাতনামা ৬০০ জনের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের ওপর হামলা, ঘরে আগুন, পুরোনো বসতবাড়িতে লুটপাট ও সাঁওতাল হত্যার অভিযোগে একটি মামলা করেন। পরবর্তী সময়ে ২৬ নভেম্বর থোমাস হেমরম ৩৩ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত পরিচয় ৩০০-৪০০ জনের বিরুদ্ধে একই অভিযোগে মামলা করেন। পরে উচ্চ আদালত দুটি অভিযোগকে সমান মর্যাদায় এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং মামলার তদন্তভার পিবিআইকে প্রদান করা হয়। তবে এক বছর পেরিয়ে গেলেও তদন্তে তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। উচ্ছেদের শিকার অনেক পরিবার অন্যের জমিতে কিংবা পতিত জায়গায় কোনোমতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করলেও তাদের সহযোগিতায় কিংবা পুনর্বাসনে সরকারের দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেই।

এ ছাড়া দুই সংখ্যালঘু তরুণ ইসলাম ধর্ম অবমাননা করেছেন, এমন অভিযোগ তুলে কুমিল্লার হোমনায় বাগসীতারামপুরের জেলেপাড়ায় হামলা হয় ২০১৪ সালের ২৬ এপ্রিল। স্থানীয় কিছু ব্যক্তি মাদ্রাসার দুজন শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে হামলা চালায়। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নঈম মোল্লা তাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ওই দুই সংখ্যালঘু তরুণ ইসলাম ধর্ম অবমাননা করেছেন, এমন অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তবে এ ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীকে অদ্যাবধি চিহ্নিত করা যায়নি। ■



# নারী দিবস ও কিছু বিক্ষিপ্ত ভাবনা

শান্তা ইসলাম

প্রায় ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নারীর প্রতি সব রকমের বৈষম্য, সহিংসতার প্রতিবাদ জানিয়ে, বৈশ্বিক সকল উন্নয়নে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং নারী অগ্রগতিকে অভিবাদন জানিয়ে বিশ্বে নারী দিবস পালিত হয়ে আসছে। বর্তমান বিশ্বে প্রায় সব কয়টি দেশ প্রতিবছর উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

তবে, এই দিবস উদ্‌যাপনের পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে একটি সুচ কারখানার নারী শ্রমিকগণ কর্মক্ষেত্রে মানবেতর অবস্থা ও ১২ ঘণ্টা কর্মদিবসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তাদের এ আন্দোলনে পুলিশ আক্রমণ চালায়, আন্দোলনকারীরা শিকার হন হামলা ও নির্যাতনের। তবে তারা থেমে যাননি। ১৮৬০ সালে তারা গঠন করেন নারী শ্রমিক ইউনিয়ন। নারীদের অধিকার আদায়ের এ আন্দোলন পায় সাংগঠনিক রূপ। তবে নারী দিবস তার আজকের অবস্থানে এক দিনে আসেনি। পেরোতে হয়েছে অনেকটা সময়। ১৯০৮ সালে নিউ ইয়র্কে প্রায় ১৫ হাজার নারী কাজের পরিবেশ, কর্মঘণ্টা, ভালো বেতন ও ভোট দেয়ার অধিকারের দাবিতে মিছিল করেন। তাদের এ আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯০৯ সালে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয়ভাবে ২৮ ফেব্রুয়ারি নারী দিবস পালন করা হয়। ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। এবং এখান থেকেই আন্তর্জাতিকভাবে নারী দিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে, ১৯১১ সালে ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি ও অস্ট্রিয়াসহ কয়েকটি দেশে ১৯ মার্চ নারী দিবস পালিত হয়।

পরবর্তী সালগুলোতে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করে আরো বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ট্রায়াঙ্গাল ফায়ার খ্যাত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিউ ইয়র্কে ১৪০ জন নারী শ্রমিক নিহত হন। এরই মধ্যে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, যাতে রাশিয়া প্রায় ২০ লক্ষ লোক হারায়। এই যুদ্ধের বিপক্ষে এবং সর্বজনীন শান্তি কামনায় রাশিয়ার নারীরা ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রবিবার নারী দিবস পালন করেন। একই সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ৮ মার্চ ও তার আগে-পরের দিনগুলোতে নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার নারীরা ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রবিবার অবরোধের ঘোষণা দেন। ইতিহাসে একে চিহ্নিত করা হয় 'Strike for Bread and Peace' নামে।

তাদের আন্দোলনের মুখে জার বাধ্য হন নারীদের ভোটাধিকার দিতে। ১৯৪৫ সালে স্বাক্ষরিত হয় জাতিসংঘ সনদ, ইতিহাসে এটি প্রথম আন্তর্জাতিক সনদ, যাতে নারী-পুরুষের সমতার কথা বলা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে আসছে। নারী অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ গ্রহণ করেছে বেইজিং ডিক্লারেশন, বৈষম্য বিলোপ সনদ-সিডওসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ। পাশাপাশি, নারী-পুরুষের সমানাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে ২০১০ সালে গঠন করা হয় ইউএন উইমেন। তাছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০-এর অভীষ্ট ৫-এ সরাসরি লিঙ্গসমতার কথা বলছে। পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ নারীদের বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০-এর 'মূল লক্ষ্য উন্নয়ন থেকে কেউ বাদ যাবে না' তা অর্জন করা সম্ভব হবে না।

এই চার মাপকাঠির ভিত্তিতে এই সূচক প্রকাশ করা হয়। তবে, নারী অধিকারকর্মীরা বিষয়টিকে বেশ ভালোভাবে নিয়েছেন। তারা বলছেন, এ অর্জনকে ছোট করে দেখবার কোনো সুযোগ নেই। নারী অধিকার রাতারাতি অর্জন করা সম্ভব নয়। নারীর অধিকার যে মানবাধিকার, এ ব্যাপারটি বুঝতে বিশ্বের আরো সময় প্রয়োজন। এখন নারীদের তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আরো সংঘবদ্ধ হতে হবে। নারীর সমতার বিষয়টি এখন দেখা হচ্ছে প্ল্যানেট ৫০-৫০ হিসেবে। এর সঙ্গে নারীর মানবাধিকার, ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গসমতার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলা হচ্ছে। নারী উন্নয়ন মডেল অনুযায়ী, সমতা এবং ক্ষমতায়নের জন্য চারটি বিষয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রথমত, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নারীর মালিকানা স্থাপন; দ্বিতীয়ত, মানসম্মত কাজের পরিবেশ ও মজুরি;

নানা সময়ে পালিত ৮ মার্চের চিত্র

এই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালেও নারীর অগ্রগতিকে গতিশীল করার প্রত্যয়ে 'সময় এখন নারীর : উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্মজীবনধারা'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হতে যাচ্ছে। তবে নারী অধিকার আদায়ের আন্দোলনের এত বছর পার হয়ে গেলেও এখনো নারীর প্রতি বৈষম্য, অন্যায়, অবিচার, সহিংসতা বন্ধ হয়নি। ২০১৮-এর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য গ্রহণ করা হয়েছে নারীদের উন্নয়নের সকল প্রেরণাকে বাস্তবিক রূপ দেয়ার প্রয়াসে, গ্রাম-শহরের সর্বস্তরের নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, সেই সঙ্গে সকল নারী মানবাধিকারকর্মীকে সম্মাননা জানাতে, তাদের সম্ভাবনা ও যোগ্যতাকে বাস্তবে পরিণত করতে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ২০১৭-তে প্রকাশিত Global Gender Gap Report প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক বিশ্ব পেতে আমাদের আরো ২০০ বছরের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে। অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়ন– তৃতীয়ত, শান্তি ও ন্যায়বিচার বা ন্যায্যতা। এবং চতুর্থত সব স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সারা বিশ্বে কৃষিখাতে নিয়োজিত কর্মশক্তির ৪৩ ভাগই নারী, কিন্তু তাদের নামে রয়েছে মাত্র ২০ ভাগ ভূমি।

গণমাধ্যম সূত্রে আমরা জানতে পারি, ২০১৬ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী দেশের ৫ কোটি ৪১ লাখ কর্মজীবীর মধ্যে ১ কোটি ৬২ লাখ নারী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৬৯৭ জন। বিদেশে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত ৭৬ লাখ প্রবাসীর মধ্যে ৮২ হাজার ৫৫৮ জন নারী। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত তৈরি পোশাকশিল্পের ৮০ ভাগ কর্মীই নারী। আর দেশের ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্রঋণ ব্যবহারকারীও নারী। এ ছাড়া বাংলাদেশে সরকারি ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০ লাখ ৯৭ হাজার ৩৩৪টি। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮৩ হাজার ১৩৩, অর্থাৎ শতকরা ৭.৬ ভাগ। উপসচিব পদ থেকে সচিব পদ পর্যন্ত নারীদের সংখ্যা মাত্র ১

শতাংশ বা তারও কম। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিচার বিভাগে বিচারক পদের ১০ শতাংশ নারী। তবে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি পদে এখনো কোনো নারীকে দেখা যায়নি। জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ প্রতিবেদন অনুসারে, দেশে নারী শ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে ৮ লাখ। তারা সবাই মজুরিবৈষম্যের শিকার। পুরুষের সমান কাজ করলেও নারী মজুরি পান কম। উদাহরণস্বরূপ গ্রামাঞ্চলে একই কাজ করে পুরুষ শ্রমিকরা গড়ে ১৮৪ টাকা পেলেও নারী শ্রমিকরা পান মাত্র ১৭০ টাকা। খোদ যুক্তরাজ্যেও নারীরা মজুরিবৈষম্যের শিকার হন। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, সে দেশে নারীরা পুরুষের চেয়ে ১৪ শতাংশ কম আয় করেন।

প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইটস (পিএইচআর) ভিত্তি জরিপ ২০১১ এবং বাংলাদেশ ব্যুরো বিবিএস জরিপ ২০১১ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫৩ শতাংশ নারী স্বামীর দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হন এবং ৮৭ শতাংশ নারী জীবনে একবার হলেও স্বামীর দ্বারা কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হন। বলা হয়ে থাকে, বিশ্বের নারীরা যদি তাদের শিক্ষাবর্ষে আর এক বছর যোগ করার সুযোগ পায়, তবে তা তাদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে আরো ২৫ ভাগ ত্বরান্বিত করবে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সমতা অর্থনীতিকে আরো বেগবান করবে। এ ছাড়া, লিঙ্গসমতা অর্জন ২০২৫ সাল নাগাদ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিতে ১২ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার যোগ করবে।

নারী দিবস নিয়ে খুব সচেতনভাবে সম্ভাবনার কথা লিখতে বসেছিলাম। কিন্তু নারী অগ্রগতি, একটি সমতাভিত্তিক সমাজ নির্মাণের পথের আশঙ্কাগুলি এড়িয়ে যেতে পারিনি। বরং তা খুব স্পষ্ট। কারণ আমরা এমন একটি সময়ে দাঁড়িয়ে নারী অগ্রগতির কথা বলছি, বিশ্বব্যাপী নারীর ক্ষমতায়নকে উদ্‌যাপন করছি, যখন সিরিয়ার নারীরা বাধ্য হচ্ছে রিফিউজি ক্যাম্পগুলোতে অনাহারে থাকতে। সামান্য খাবারসুবিধা পেতে তাদের যৌনবৃত্তি করতে হচ্ছে। কিংবা দেশের নারায়ণগঞ্জে ছয় বছরের শিশুকে আধোবোলে তার বাবাকে জানাতে হচ্ছে তার ওপর ঘটে যাওয়া ধর্ষণের বর্ণনা।

২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে বেশ কিছু দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, নারীর প্রতি সহিংসতা অনিবার্য কিছু নয়। এটি বন্ধে সবাইকে কার্যকর অংশগ্রহণ করতে হবে। নারীদের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা তাদের ওপর ঘটতে যাওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে এবং নিজেদের জীবন গড়তে পারে। অন্যায়কারী অর্থাৎ দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তার শাস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। লজ্জার এবং ভয়ের সংস্কৃতি থেকে বের হতে হবে নারীকে। নারীর অধিকার রক্ষায় এবং সহিংসতার শিকার নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করতে হবে। ■

**তথ্যসূত্র**

১. নারীর সমতা : জরিপ ও বাস্তবতা, ৮ মার্চ ২০১৬তে *ডয়েচে ভয়েল* পত্রিকায় প্রকাশিত।

২. Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮তে প্রকাশিত।

৩. জাতিসংঘ ও এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের ওয়েবসাইট।



# শিশুকে শেখাতে শাস্তি কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়

**রাশেদা আক্তার**

আবারও সংবাদপত্রের শিরোনাম 'শিক্ষকের বেত্রাঘাতে ক্লাসে জ্ঞান হারালো শিক্ষার্থী'। নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে উচিৎপুরা ইউনিয়নে জাঙ্গালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্র এই ঘটনার শিকার হয়েছে। গত ১ মার্চ ২০১৮ দৈনিক *বাংলা ট্রিবিউন*-এ প্রকাশিত খবরে জানা যায়– ঘটনার দিন ফয়সাল নামে ওই শিক্ষার্থী বাড়িতে কাজ ছিল বিধায় টিফিন পিরিয়ডে স্কুল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। পরদিন মঙ্গলবার শিশুটি বিদ্যালয়ে গেলে সেখানকার একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক এই বিষয়ে জানতে চান এবং না বলে যাওয়ার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেন। মারধরের এক পর্যায়ে শিশুটি জ্ঞান হারিয়ে ক্লাসকক্ষে পড়ে যায়। অভিভাবকরা খবর পেয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে স্থানীয়ভাবে তার চিকিৎসা করান। কিন্তু ঘটনার পর স্থানীয় প্রভাবশালীরা বিষয়টি মীমাংসা করার কথা বলে অভিভাবকদের (এই প্রতিবেদন পাওয়া পর্যন্ত) থানায় অভিযোগ করতে দেননি।

গত ৬ মার্চ ২০১৮, দৈনিক *সমকাল*-এর সংবাদ 'মাদ্রাসা শিক্ষকের নির্যাতনের শিকার শিশুটি বাঁচলো না'। তাওহিদুলের বয়স মাত্র ১০ বছর। তার অপরাধ ছিল, সে পড়া মুখস্থ করতে পারেনি। আর তাই মাদ্রাসা শিক্ষক আমিনুল ইসলাম মেরে তার পাঁজর ও হাড় ভেঙে দেয়। নির্যাতনের মাত্রা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে গুরুতর আহত শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনা হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি। তাওহিদুলের হত্যার বিষয়টি অত্যন্ত বেদনাদায়ক, নিষ্ঠুর আর নির্মম। একটি শিশুর এমন মৃত্যু কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। মাদ্রাসা শিক্ষায় একটি বিষয় লক্ষণীয়। এখানে অধিকাংশ শিশু নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসে। আর সে কারণে নির্যাতনকারীরা কোনো কিছুর তোয়াক্কা করে না। অন্যায় করেও অনায়াসে পার পেয়ে যায়। অথবা বছরের পর বছর বিচারের আশায় থেকে একসময় তা সবার নজর এড়িয়ে যায়। ফলে নির্যাতনকারীর জন্য সমাজে কোনো দৃষ্টান্ত তৈরি হয় না। বিদ্যালয়সহ মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় খুব দ্রুত সরকারের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা না গেলে তাওহিদুলদের হত্যার দায় আমরা কেউ এড়াতে পারব না।

আমাদের সমাজে শিশুদের শারীরিক শাস্তি প্রদানের প্রথা বহু আগে থেকেই প্রচলিত। এর ফলে সমাজে মানুষের কাছে শিশু নির্যাতনের বিষয়গুলি এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায়।

তাই শিশুরা নিজ পরিবার, বিদ্যালয়সহ সমাজের সর্বত্র শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। এ ক্ষেত্রে শিশুকে শাস্তি দানের প্রতি যে মৌন সমর্থন, সেটাই অনেকাংশে দায়ী বলে মনে হয়। আর শিক্ষক দ্বারা নির্যাতন অনেক সময় বর্বরোচিত ও নৃশংসতাকেও হার মানায়।

আসক-এর তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের তৈরি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৭ সালে মোট ১ হাজার ৫৫ জন শিশু বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মামলা হয়েছে ৪৬৪টি। এই সময়কালে মোট ৬২০ জন শিশু হত্যার শিকার হয়েছে আর মামলা হয়েছে মাত্র ২০৯টি। এ ছাড়াও শিক্ষক কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়েছে মোট ১০৫ জন শিশু, মামলা হয়েছে ১১টির ক্ষেত্রে। শিক্ষকের দ্বারা যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের শিকার শিশু মোট ৪৯ জন আর এ বিষয়ে মামলার সংখ্যা ছয়টি। শিক্ষকের নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছে দুজন শিশু এবং পাঁচজন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে।

হত্যার শিকার তাওহিদুল

ছাত্র নির্যাতনকারী শিক্ষক আমিনুল ইসলাম

ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিশু নির্যাতনকারীর তালিকায় রয়েছে সমাজের প্রায় সকল শ্রেণির পেশাজীবী মানুষ। খুব তুচ্ছ কারণে নির্যাতনের ঘটনাগুলো ঘটে থাকে। এর অন্যতম কারণ শিশুরা বড়দের তুলনায় শারীরিকভাবে দুর্বল, বুদ্ধিতে অপরিপক্ব এবং সম্পূর্ণরূপে বড়দের ওপর নির্ভরশীল। তাই যে-কোনো তুচ্ছ কারণে শিশুদের ওপর খড়্গ তোলা খুব সহজ একটি বিষয়। সামান্য চুরির ঘটনা কিংবা পারিবারিক দ্বন্দ্ব যা-ই হোক না কেন, শিশুরাই এর বলি হয় প্রথমে। তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুদের সামান্য ভুলকে অনেক বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য করে শাস্তিদানের মাত্রাও এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ও কাম্যও নয়।

২০১১ সালের ১৩ জানুয়ারি মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তির নামে শিক্ষার্থী নির্যাতন করা অবৈধ, অসাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি বলে রায় দিয়েছেন এবং এই রায়ের সারসংক্ষেপে উল্লেখ আছে যে, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বাংলাদেশে বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসে শিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা প্রদানই ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বিকাশে সাহায্য করে। এ কারণে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষাদান করা প্রত্যেকটি শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া উচিত। শারীরিক ও মানসিক শাস্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের বহুল প্রচলিত যে ধারা চলে আসছে তা কোনোভাবেই যেমন একজন শিক্ষার্থীর কাম্য নয়, ঠিক তেমনি শিক্ষকদেরও শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করা থেকে বিরত থাকা উচিত। তার পরও যদি কোনো ছাত্র বা ছাত্রী শ্রেণিকক্ষে দুর্বিনীত আচরণ করে, তার অভিভাবককে ডেকে এনে বিষয়টির সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান করা যাবে না। এই সারমর্মে এটিও উল্লেখ রয়েছে যে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তির ফলে শিক্ষার পরিবেশ যেমন ব্যাহত হয়, অন্যদিকে তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।'

মহামান্য আদালতের এই রায়ের সূত্র ধরেই ২০১১ সালের ২৫ এপ্রিল শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি না দেয়ার নির্দেশ দিয়ে নীতিমালা জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১১ শিরোনামে জারীকৃত। এ নীতিমালায় সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, উচ্চমাধ্যমিক কলেজ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাসহ (আলিম পর্যন্ত) সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। এ ছাড়া এ নীতিমালার পরিপন্থি কাজের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

তথাপি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুদের শাস্তি প্রদানের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তাই এই এই নীতিমালাটির বাস্তবায়নে সুষ্ঠু তদারকির বিষয়ে সরকারের জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। কতজন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে সেটি বড় কথা নয়, একটি শিশুও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার নির্যাতনের শিকার হবে না, সেটি নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। ■

**তথ্যসূত্র**

১. *প্রথম আলো*, *সংবাদ*, *ইত্তেফাক*, *সমকাল*, *নয়া দিগন্ত*, *ডেইলি স্টার*, *নিউ এজ*, *ঢাকা ট্রিবিউন* ও আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য।
২. http://www.supremecourt.gov.bd/resources/documents/297208_WP%20No.5684%20of%202010%20_C.Punishment_-final.pdf
৩. https://www.blast.org.bd/content/cp/cp-guideline-english.pdf